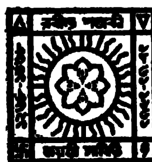
রবীন্দ্র-চরিত

শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য



পশ্চিমবঙ্গ রবীন্দ্র শতাব্দী জয়ন্তী সমিতির পক্ষে
বঙ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তকবিক্রেতা সভা কর্তৃক প্রকাশিত

প্রকাশক জানকীনাথ বসু
বঙ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তকবিক্রেতা সভা
৯৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা--৭

প্রথম প্রকাশ : ১৩৬৭

মুদ্রাকর শ্রীপ্রভাতচন্দ্র চৌধুরী
লোক-সেবক প্রেস
৮৬-এ, লোয়ার সারকুলার রোড
কলিকাতা--১৪

ভূমিকা

বাংলা বর্ণজ্ঞান আছে অথচ উচ্চশিক্ষার সুযোগ পান নাই এমন লোকের সংখ্যা আমাদের দেশে নিতান্ত কম নয়। এই অনতিশিক্ষিত বিপুল জন-সমষ্টিকে রবীন্দ্রনাথের জীবন ও কর্মসাধনার সহিত পরিচিত করিয়া দিবার উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ রবীন্দ্র শতাব্দী জয়ন্তী সমিতি একটি গ্রন্থ প্রণয়নের অভিপ্রায় করেন। তদনুসারেই রবীন্দ্রচরিত রচিত হইল।

এই গ্রন্থের ভাষা যথাসম্ভব সহজ করা হইয়াছে। সহজ শব্দটার মধ্যে স্বাভাবিকতার ইঙ্গিত আছে। সহজ করিবার আত্যন্তিক প্রয়াসে ভাষা অস্বাভাবিক হইয়া পড়ে, ভাষা তাহার স্বরূপ হারায়। শিশুসাহিত্যিকদিগকে কখনো কখনো 'জোড়া-কথা-ছাড়া' বই লিখিতে দেখিয়াছি।—শিশুদের পক্ষে এত বড় বিপত্তির কথা আমি কল্পনা করিতে পরি না। পাঠকের বয়স সাতই হউক আর সাতাশই হউক তাঁহার বুদ্ধি সম্পর্কে কৃপার মনোভাব লইয়া লিখিতে গেলে লেখকের ভাণ্ডার সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হইতে পায় না। দাতা ও গ্রহীতা উভয়ের পক্ষেই সেটা বিড়ম্বনার বিষয়। বর্তমান গ্রন্থ রচনার সময় এই কথাটি একবারও ভুলি নাই।

যাঁহার জীবনকথা লিখিতে বসিয়াছি এই প্রসঙ্গে তাঁহারই 'জীবনস্মৃতি' হইতে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিঃ

> "আগাগোড়া সমস্তই সুস্পষ্ট বুঝিতে পারাই সকলের চেয়ে পরম লাভ নহে। আমাদের দেশে কথকরা এই তত্ত্বটি জানিতেন। সেজন্য কথকতার মধ্যে এমন অনেক বড়ো বড়ো কান-ভরাট-করা সংস্কৃত শব্দ থাকে এবং তাহার মধ্যে এমন তত্ত্বকথাও অনেক নিবিষ্ট হয় যাহা শ্রোতারা কখনো সুস্পষ্ট বোঝে না কিন্তু আভাসে পায়—এই আভাসে পাওয়ার মূল্য অল্প নহে। যাঁহারা শিক্ষার হিসাবে জমাখরচ খতাইয়া বিচার করেন তাঁহারাই অত্যন্ত কষাকষি করিয়া দেখেন যাহা দেওয়া গেল তাহা বুঝা গেল কি না। বালকেরা এবং যাহারা অত্যন্ত শিক্ষিত নহে, তাহারা জ্ঞানের যে প্রথম স্বর্গলোকে বাস করে সেখানে মানুষ না বুঝিয়াই পায়।"

এ গ্রন্থে "বড়ো বড়ো কান-ভরাট-করা সংস্কৃত শব্দ" এবং সুগভীর "তত্ত্বকথা" সন্নিবেশের দুঃসাহস করি নাই। তবে রবীন্দ্রনাথের রচনা হইতে মাঝে মাঝে দুই চারি ছত্র উদ্ধার করিয়াছি বই কি। সুতরাং আভাসে যাহার মূল্য বুঝিতে হইবে এমন উপকরণের নিতান্ত অভাব হইবে না। জ্ঞানের প্রথম স্বর্গলোকবাসী "বালকেরা এবং যাহারা অত্যন্ত শিক্ষিত নহে" তাহারা সকলেই এ গ্রন্থ হইতে আপন আপন প্রাপ্যটুকু বুঝিয়া বা না বুঝিয়া কতটা পাইল আর কতটা পাইল না জানিবার জন্য উৎসুক রহিলাম।

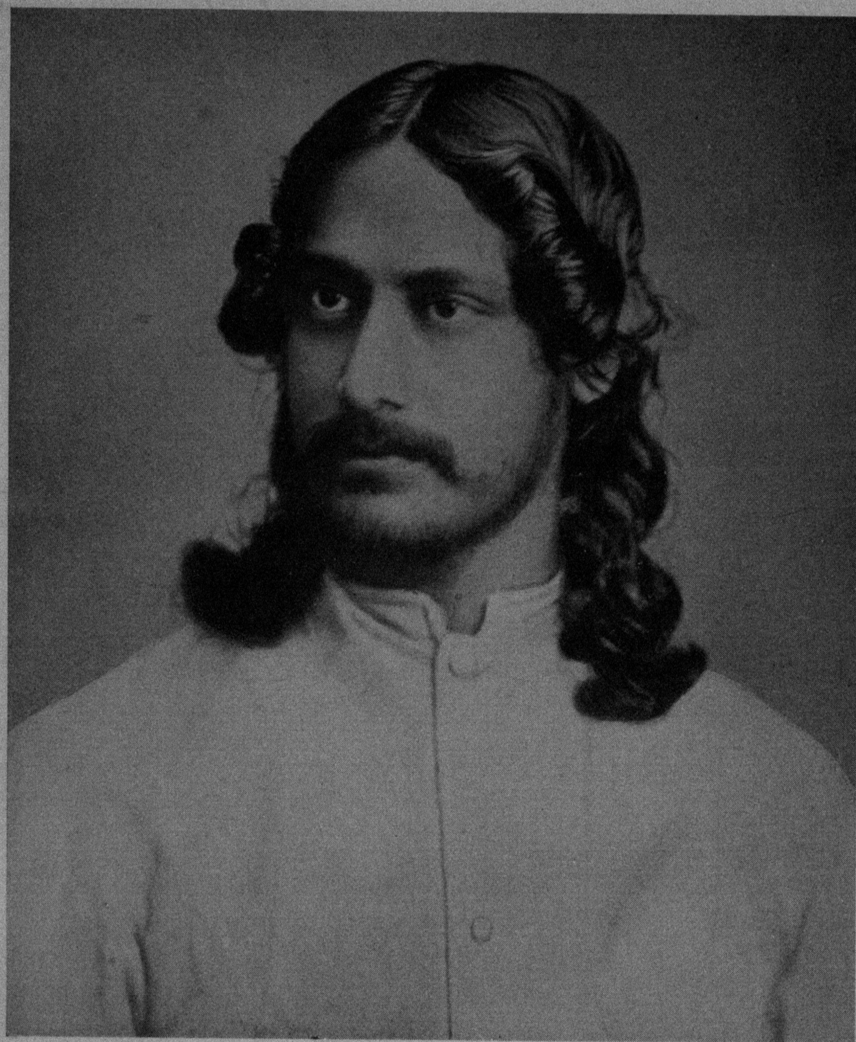
গ্রন্থটির আয়তন নিতান্তই ক্ষুদ্র সেই জন্য বস্তু নির্বাচনে বড় বেশী বাছবিচার করিতে হইয়াছে। উপকরণের বাহুল্য ঘটিলে নির্বাচনকার্য অনায়াসসাধ্য থাকে না—এক্ষেত্রে তাহাই হইয়াছে। কবির বিরচিত 'জীবন-স্মৃতি' 'ছেলেবেলা' ছাড়াও তাঁহার পত্রাবলি আছে। শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের চারি খণ্ডে সম্পূর্ণ 'রবীন্দ্র জীবনী' রবীন্দ্র জীবনের তথ্য-বহুল সুবৃহৎ প্রমাণিক ইতিহাস। ইঁহার রচিত সংক্ষিপ্ততর গ্রন্থ 'রবীন্দ্র জীবন কথা'ও একটি মূল্যবান বই, সাধারণ পাঠকের পক্ষে অপরিহার্য। সর্বোপরি শ্রীপুলিনবিহারী সেনের আজীবন গবেষণালব্ধ রবীন্দ্রজীবন ও সাহিত্য সম্পৃক্ত অমূল্য তথ্যরাজি—'গ্রন্থপরিচয়' নামে যেগুলি বিশ্বভারতী প্রকাশিত ছাব্বিশ খণ্ড রবীন্দ্ররচনাবলীর প্রতি খণ্ডে সংযোজিত হইয়াছে। পুলিনবাবুর আর এক কীর্তি 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'-গুলি। রবীন্দ্রনাথের পরিচায়ক হিসাবে এই পত্রিকাগুলির মূল্যও কম নয়। ইহা ছাড়া বর্তমান লেখকের 'প্রভাতরবি' বইটিও কাজে লাগিয়াছে। যাঁহাদের গ্রন্থাদি ব্যবহার করিয়াছি তাঁহাদের কাছে ঋণ স্বীকার না করিয়া দান স্বীকার করাই ভাল; ঋণ লইলে পরিশোধের দায়িত্ব থাকিয়া যায় দান লইলে সে বালাই থাকে না।

পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক সমিতির সম্পাদক শ্রীজানকীনাথ বসু মুদ্রণ-কার্য ত্বরান্বিত করিবার জন্য যথাসাধ্য পরিশ্রম করিয়াছেন। তাঁহার ব্যক্তিগত চেষ্টা ব্যতীত এ বই যথাসময়ে বাহির হইতে পারিত না।

শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য

শ্রীমান্ অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য

কল্যাণীয়েষু,—



জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি

বিবেকানন্দ রোডের চৌমাথা পার হইয়া চিৎপুর রোড ধরিয়া একটু দক্ষিণে গেলেই বাঁ-দিকে দেখা যায় একটা সরু গলি। গলিটা বড় রাস্তা হইতে বাহির হইয়া পূর্বমুখে কয়েক পা গিয়াই একটা সাবেককালের প্রকাণ্ড বাড়ির ফটকের সামনে থামিয়া গিয়াছে।

গলিটার নাম দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলি। সে নামটা একালের দেওয়া। কিন্তু ঠাকুরবাড়ি নামটা পুরাতন। এই বাড়ির যিনি প্রথম পত্তন করেন তাঁহার নাম নীলমণি ঠাকুর।

এই নীলমণির পৌত্র দ্বারকানাথ ঠাকুর। দেশের লোকের যাহাতে মঙ্গল হয়, তাহাদের সুখ-সুবিধা হয় এমন সকল কর্মেই দ্বারকানাথের দৃষ্টি ছিল। বাংলাদেশে ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্তন তাঁহার চেষ্টার ফলেই সম্ভব হয়। মেডিকাল কলেজ স্থাপনার ব্যাপারেও তিনি অগ্রণী ছিলেন। রাজা রামমোহন যখন সতীদাহ-প্রথা নিবারণের জন্য চেষ্টা করেন তখন দ্বারকানাথ তাঁহাকে সমর্থন ও সাহায্য করেন।

ইংরাজী ও ফারসী ভাষা তিনি খুব ভালভাবে শিক্ষা করিয়াছিলেন। আইন বিষয়েও তাঁহার অসাধারণ জ্ঞান ছিল। সেকালে হিন্দুর পক্ষে বিলাতযাত্রা নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু দ্বারকানাথ প্রচলিত সংস্কার না মানিয়া ইউরোপে গিয়াছিলেন।

বিলাত হইতে ফিরিলে আত্মীয়-কুটুম্বরা তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে বলেন। কিন্তু দ্বারকানাথ তাহাতে সম্মত হন নাই।

দ্বারকানাথের জ্যেষ্ঠপুত্র দেবেন্দ্রনাথ। ন্যায়নিষ্ঠা, কর্তব্য-জ্ঞান ও ধর্মসাধনার জন্য ইঁহার নাম বিখ্যাত। ইঁহার ভক্ত ও শিষ্যেরা ইঁহাকে মহর্ষি বলিতেন। রবীন্দ্রনাথ ইঁহারই পুত্র। রবীন্দ্রনাথের চরিত্রে ইঁহার অনেকগুণই দেখিতে পাই।

গণ্ডির বন্দী

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতেই রবীন্দ্রনাথের জন্ম হয়—আজ হইতে ঠিক এক-শ বছর আগে ১২৬৮ সালের ২৫শে বৈশাখ; ইংরাজী ১৮৬১, ৭ই মে।

রবীন্দ্রনাথের মাতা সারদাদেবীর পনেরোটি ছেলেমেয়ে, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার চতুর্দশ সন্তান। বাড়িতে লোকজন অতিথি-অভ্যাগতের অভাব ছিল না। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কলিকাতায় অল্পই থাকিতেন। এতবড় সংসারের দেখাশোনার সমস্ত ভার ছিল মায়ের উপর। তাই ছেলেদের দিকে তিনি সব সময় ভাল করিয়া নজর দিতে পারিতেন না।

রবীন্দ্রনাথের বাল্যকাল কাটে চাকরদের কাছে। সে কাল খুব সুখের ছিল না। শ্যাম নামে একটি চাকর ছিল। সে দোতলার একটি ঘরে বালককে বসাইয়া তাঁহার চারিদিকে খড়ির দাগের গণ্ডি আঁকিয়া চলিয়া যাইত। বলিয়া যাইত গণ্ডির বাহিরে গেলেই বিপদ। কি যে বিপদ তাহা তিনি জানিতেন না। কিন্তু লক্ষ্মণের গণ্ডির বাহিরে গিয়া সীতা রাবণের হাতে ধরা পড়িয়াছিলেন সেই কথা মনে করিয়া তাঁহার ভয় হইত। শ্যাম আসিয়া যতক্ষণ না মুক্তি দিত ততক্ষণ তাঁহার বন্দীদশা ঘুচিত না।

ঘরের দক্ষিণ দিকের খোলা জানলার সামনে একটা পুকুর।

তাহার পূর্বদিকে একটা প্রকাণ্ড চীনাবট প্রাচীন প্রহরীর মত দাঁড়াইয়া আছে। ঐ পুকুরটার দিকে তাকাইয়া তাঁহার নির্জন নিঃসঙ্গ দুপুরটা কাটিয়া যাইত। দুই বন্দী দুই দিকে।

সেই পুকুরের
ছিনু আমি দোসর দূরের
বাতায়নে বসি নিরালায়,
বন্দী মোরা উভয়েই জগতের ভিন্ন কিনারায়।

বিদ্যারম্ভ

চার-পাঁচ বছর বয়সেই পড়াশোনা আরম্ভ হয়। "সকাল থেকে রাত পর্যন্ত পড়াশুনোর জাঁতাকল চলেছেই। ঘর্ঘর শব্দে এই কলে দম দেওয়ার কাজ ছিল সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথের হাতে।" বাংলা, সংস্কৃত, ইংরাজী, বিজ্ঞান, অস্থিবিদ্যা—সকল বিষয়ই পড়া চলিতেছে। মাস্টার মহাশয়রা বাড়িতে আসিয়া পড়াইয়া যান। ভোরবেলা একজন পালোয়ান আসিয়া কুস্তি শেখান।

ঠাকুরবাড়িতে বিষ্ণু চক্রবর্তী নামে একজন গায়ক ছিলেন। তাঁহার কাছে দেশী গান শেখাও আরম্ভ হইল।

ছ-বছর বয়সে তিনি প্রথম ইস্কুলে ভরতি হন কেবল কান্নার জোরেই। তাঁহার দাদা সোমেন্দ্রনাথ আর ভাগ্নে সত্যপ্রসাদ বয়সে তাঁহার চেয়ে কিছু বড় ছিলেন। তাঁহারা প্রতিদিন দশটার সময় ঘোড়ার গাড়ি চড়িয়া ইস্কুল যাইতেন আবার বিকাল চারটায় গাড়ি চড়িয়া ফিরিতেন। দেখিয়া ইস্কুল যাইবার জন্য তিনিও বায়না ধরিলেন। নিতান্ত ছেলেমানুষ বলিয়া ইস্কুলে ভরতি করিতে দাদাদের আপত্তি ছিল। কিন্তু কবির কান্নার কাছে তাঁহাদের হার মানিতে হইল। তখন বাড়িতে যিনি পড়াইতেন তাঁহার নাম মাধব পণ্ডিত। মাধব তাঁহার কান্না শুনিয়া বলিয়াছিলেন, "এখন ইস্কুলে যাবার জন্য যেমন

কাঁদিতেছ, না যাবার জন্য ইহার চেয়ে অনেক বেশী কাঁদিতে হইবে।" এই গুরুবাক্য তাঁহার জীবনে মিথ্যা হয় নাই।

প্রথম যে বিদ্যালয়ে তিনি ভরতি হন তাহার নাম ওরিয়েন্টাল সেমিনারি। ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে বছরখানেক কাটাইয়া আসেন নর্মাল স্কুলে, নর্মাল স্কুলের পর বেঙ্গল অ্যাকাডেমিতে।

বেঙ্গল অ্যাকাডেমিতে পড়িতে পড়িতেই তাঁহার উপনয়ন হয়। এটি একটি ফিরিঙ্গী স্কুল, ফিরিঙ্গী ছেলেরাই সে ইস্কুলে পড়িত। পৈতার পর নেড়া-মাথা লইয়া কেমন করিয়া তাহাদের মধ্যে গিয়া বসিবেন—এই তাঁহার এক মহা ভাবনা হইল। ছেলেগুলো ভারী দুরন্ত। এমনিতেই নানারকম উৎপীড়নে তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে। নেড়া-মাথা দেখিলে মাথাটাকেই হয়তো আস্ত রাখিবে না।

সৌভাগ্যক্রমে সে দুর্ভাবনা কাটিয়া গেল। ইস্কুল আর যাইতে হইল না, মহর্ষি তাঁহাকে লইয়া বোলপুরে গেলেন।

নবজীবন

বোলপুরের নির্জন প্রান্তরে মহর্ষি কিছু জমি কিনিয়া একটি একতলা বাড়ি তৈয়ার করান। মাঝে মাঝে তিনি এখানে আসিয়া থাকিতেন, ছেলেরাও মধ্যে মধ্যে আসিয়া বাস করিতেন। জনহীন মাঠের মধ্যে দুটি ছাতিমগাছ ছিল। মহর্ষি সেই গাছের তলায় বসিয়া উপাসনা করিতেন। দুটি গাছের একটি এখনও আছে। আজও দর্শনার্থীরা শান্তিনিকেতনে গেলে সপ্তপর্ণি-তলে মহর্ষির সাধনবেদীটি দেখিতে ভুলেন না।

বোলপুরে আসিবার আগে কবি একবার মাত্র কলিকাতার বাহিরে গিয়াছিলেন। তখন তাঁহার বয়স বছর আষ্টেক। কলিকাতায় সেবার ডেঙ্গুজ্বর হওয়ায় দাদারা পেনেটিতে গঙ্গার ধারে এক বাগানবাড়িতে গিয়া আশ্রয় লন। কবিও তাঁহাদের সঙ্গে গিয়াছিলেন। বাগানবাড়ির বারান্দায় বসিয়া গঙ্গার দিকে চাহিয়া চাহিয়া তাঁহার দিন কাটিয়া যাইত। এখানেও তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পান নাই। বাগানের বাহিরে যাওয়ার ইচ্ছা হইলেও উপায় ছিল না। অভিভাবকদের নিষেধ ছিল।

বোলপুরে আসিয়া কবি নব-জীবনেব স্বাদ পাইলেন। এখানে তিনি আপন মনে মাঠে মাঠে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। পিতা তাহাতে বাধা দিতেন না। যে প্রকৃতিকে তিনি জানালার আড়াল হইতে দেখিয়া দেখিয়া মনের আশা মিটাইতেন আজ তাহাকে

একান্তভাবে আপনার কাছে পাইলেন। তাঁহার মনে আনন্দের সীমা রহিল না।

বোলপুরে কিছুদিন থাকিয়া মহর্ষি পুত্রকে লইয়া ড্যালহৌসি পাহাড়ের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। পিতার সহিত পাহাড়ে কয়েক মাস থাকিয়া মহর্ষির অনুচর কিশোরী চাটুজ্যের সহিত কবি কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন।

পাহাড়ে অবস্থানকালে মহর্ষি নিজে পুত্রকে পড়াইতেন। এই কয় মাসে তাঁহার ইংরাজী ও সংস্কৃত অনেকখানি পড়া হইয়াছিল। তাহা ছাড়া আরও একটি শিক্ষার বিষয় ছিল—জ্যোতিষ। মহর্ষি আকাশের তারা দেখাইয়া পুত্রকে গ্রহ তারকা বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। পিতার মুখে শুনিয়া শুনিয়া তাঁহার এতখানি জ্ঞান হইয়াছিল যে জ্যোতিষ বিষয়ে তিনি সেই বয়সেই একটি প্রবন্ধ লিখিয়া ফেলেন।

হিমালয় হইতে ফিরিয়া আসিয়া কবিকে আবার বেঙ্গল অ্যাকাডেমিতে যোগ দিতে হইল। কিন্তু সেখানে মন আর কিছুতেই বসিতে বসিতে চাহিল না। যখনই সুবিধা পাইতেন ইস্কুল হইতে ছুটি লইয়া বাড়ি পালাইতেন। তিনি বলিয়াছেন, "আমি ইস্কুল পালানো ছেলে, পরীক্ষা দিই নি, পাস করি নি; মাস্টার আমার ভাবীকাল সম্বন্ধে হতাশ্বাস। ইস্কুলের বাইরে যে অবকাশটা বাধাহীন সেইখানে আমার মন হাঘরেদের মতো বেরিয়ে পড়েছিল।"—কথাটা নিতান্ত মিথ্যা নয়।

বেঙ্গল অ্যাকাডেমির পালাও শেষ পর্যন্ত সাঙ্গ হইল। কিন্তু অভিভাবকরা ছাড়িলেন না। সেখান হইতে লইয়া গিয়া ভরতি করিয়া দিলেন সেন্ট জেবিয়ার্স স্কুলে। সেখানেও বছর দুই নষ্ট হইল। তাহাব পর সে স্কুলও একদিন ছাড়িয়া দিলেন। দাদারা রাগ করিলেন। বড়দিদি দুঃখ করিয়া বলিলেন, "আমরা সকলেই আশা করিয়াছিলাম বড়ো হইলে রবি মানুষের মত হইবে। কিন্তু তাহার আশাই সকলের চেয়ে নষ্ট হইয়া গেল।"

বাড়ির পড়া পুরা দমেই চলিতেছিল। কাজেই ইস্কুল পালাইয়া কোনো ক্ষতি হয় নাই। চাকরদের মহলে যে সকল বই চলিত তাহা দিয়াই কবির সাহিত্যচর্চা শুরু হয়। তাহার মধ্যে কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীদাসের মহাভারত আর চাণক্য-শ্লোকের বাংলা অনুবাদই প্রধান।

চাকরদের মধ্যে একজন ছিল ব্রজেশ্বর। সে সুর করিয়া রামায়ণ পড়িত। তাহার মুখে শুনিয়াই কবির সাতকাণ্ড রামায়ণ পড়ার কাজ হইয়া গিয়াছিল। রামায়ণ পাঠের মধ্যে মধ্যে কিশোরী চাটুজ্যে আসিয়া পড়িতেন। সমস্ত রামায়ণের পাঁচালি সুর সুদ্ধ তাঁহার মুখস্থ ছিল। তিনি কৃত্তিবাসকে ছাপাইয়া হু হু করিয়া পাঁচালির পালা আওড়াইয়া যাইতেন। সে কালে বাংলা বই বেশী ছিল না কিন্তু যতগুলা ছিল সবই তিনি পড়িয়া শেষ করিয়াছিলেন। ছেলেবেলায় বই পড়িতে পড়িতে বই পড়াটা তাঁহার অভ্যাস হইয়া গেল। সব বইয়েরই যে মানে বুঝিতে পারিতেন তাহা নয় কিন্তু যেটুকু বুঝিতেন তাহারই আনন্দে পড়া আগাইয়া যাইত।

মনে পড়ে ছেলেবেলায় যে বই পেতুম হাতে
ঝুঁকে পড়ে যেতুম পড়ে তাহার পাতে পাতে,
কিছু বুঝি কিছু নাই বা বুঝি
কিছু না হ'ক পুঁজি,

হিসাব কিছু না থাক নিয়ে লাভ অথবা ক্ষতি,
অল্প তাহার অর্থ ছিল বাকি তাহার গতি।
মনের উপর ঝরনা যেন চলেছে পথ খুঁড়ি
কতক জলের ধারা আবার কতক পাথর নুড়ি।
সব জড়িয়ে ক্রমে ক্রমে আপন চলার বেগে
পূর্ণ হয়ে নদী ওঠে জেগে।

তাঁহার বাল্যকালেই বিহারীলাল চক্রবর্তীর কবিতা এবং বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস বাহির হইতে থাকে। এগুলি তাঁহার খুব ভাল লাগিত।

সাহিত্য পাঠে তাঁহার এক সঙ্গী ছিলেন নোতুন বউঠান, জ্যোতিদাদার স্ত্রী। কবি অতি অল্প বয়সেই মাতৃহারা হন। তখন হইতে এই বউঠানই দেবরের সকল ভার নিজের হাতে তুলিয়া লন। তিনিই ইঁহাকে খাওয়াইয়া পরাইয়া সর্বদা কাছে টানিয়া ইঁহার জীবনের সকল অভাব ভুলাইবার চেষ্টা করিতেন।

রবীন্দ্রনাথ শিশুকালেই কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। বার তের বছর বয়সেই কবির রচনা পত্রিকায প্রকাশিত হইতে থাকে। ঐ বয়সের একটি কবিতার নাম 'অভিলাষ'। তাহার প্রথম স্তবকটি এইঃ

জনমনোমুগ্ধকর উচ্চ অভিলাষ!
তোমার বন্ধুর পথ অনন্ত অপার।

অতিক্রম করা যায় যত পান্থশালা,
তত যেন অগ্রসর হতে ইচ্ছা হয়।

কবির জ্যোতিদাদা পুরুবিক্রম নামে একটি নাটক লিখিয়াছিলেন। ঐ নাটকে রবীন্দ্রনাথের একটি গান আছে ঃ

এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন.
এক কার্যে সঁপিয়াছি সহস্র জীবন।
আসুক সহস্র বাধা বাধুক প্রলয়
আমরা সহস্র প্রাণ রহিব নির্ভয়।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সরোজিনী নাটকেও বালক কবির একটি গান দেওয়া হইয়াছিল। ঐ নাটকে রাজপুত রমণীদের চিতা-প্রবেশের একটি দৃশ্য আছে। জ্যোতিবাবু সে দৃশ্যের জন্য একটি গদ্য বক্তৃতা রচনা করিয়াছিলেন। ভাই বলিলেন গদ্য এখানে খাপ খাইবে না, পদ্য চাই। এই বলিয়া তিনি সঙ্গে সঙ্গে এই গানটি লিখিয়া দিলেনঃ

জ্বল্ জ্বল্ চিতা! দ্বিগুণ দ্বিগুণ
পরান সঁপিবে বিধবা বালা।
জ্বলুক্ জ্বলুক্ চিতার আগুন
জুড়াবে এখনি প্রাণের জ্বালা।

ঠাকুরবাড়িতে সর্বদাই সাহিত্যের হাওয়া বহিত। বাংলা ইংরাজী ও সংস্কৃত সাহিত্যে কবির দাদাদের গভীর অনুরাগ ছিল। কিন্তু বড়দের সাহিত্যের আসরে বালকের স্থান ছিল

না। সরোজিনী প্রকাশের পর হইতেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ভাইকে দলে উঠাইয়া লইলেন। সাহিত্য ও সংগীতচর্চার সভায় কবি তখন হইতেই পুরোদস্তুর সভ্য হইয়া উঠিলেন। এ যখনকার কথা বলিতেছি তখন কবির বয়স ষোল বৎসব মাত্র।

ইহার পূর্বেই 'বনফুল' নামে একটি সম্পূর্ণ কাব্য লেখা হইয়া গিয়াছিল। বনফুলের পর বাহির হয় 'কবিকাহিনী'। তের হইতে আঠার বছর বয়স পর্যন্ত যতগুলি কবিতা লেখা হইয়াছিল সেগুলি সংগ্রহ করিয়া একটি বই বাহির করা হয়— বইটির নাম 'শৈশব সংগীত'।

'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'র অনেক পদ এ যুগের গায়কেরা গাহিয়া থাকেন। এ পদগুলির বেশীর ভাগই তাঁহার ষোল সতের বছর বয়সের রচনা।

গহন কুসুম কুঞ্জমাঝে
মৃদুল মধুর বংশী বাজে
বিসরি ত্রাস লোক লাজে
সজনি, আও আওলো।
অঙ্গে চারু নীল বাস,
হৃদয়ে প্রণয় কুসুম রাশ
হরিণ নেত্রে বিমল হাস,
কুঞ্জবনমে আও লো।

এইটি ভানুসিংহের প্রথম কবিতা। ভানুসিংহ ঠাকুরের

পদাবলী যখন ছাপা হয় তখন তাহাতে রবীন্দ্রনাথের নাম ছিল না। ভানুসিংহ যে কবিরই ছদ্মনাম তাহা তিনি প্রথমে প্রকাশ করেন নাই। পাঠকরা ভাবিয়াছিল বিদ্যাপতি জ্ঞানদাস বা গোবিন্দদাসের মত ভানুসিংহও একজন পুরাতন বৈষ্ণব কবি।

কবিতার সঙ্গে সঙ্গে গান রচনাও চলিতেছে। ষোল সতের বছর বয়স হইতেই কবি নিজের গানে সুর দিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

কবির কণ্ঠস্বর ছিল খুব মধুর। নিয়মে অনিয়মে গান শেখারও শিশুকাল হইতে বিরাম নাই। দাদারা গানের অনুরাগী। মহর্ষির এক ভক্ত বন্ধু ছিলেন নাম শ্রীকণ্ঠ সিংহ। তিনি মাঝে মাঝে আসিয়া কিছুদিন ঠাকুববাড়িতে থাকিয়া যাইতেন। "তাঁহার বাম পার্শ্বের নিত্য সঙ্গিনী ছিল একটি গুড়গুড়ি, কোলে কোলে সর্বদাই ফিরিত একটি সেতার, এবং কণ্ঠে গানের বিশ্রাম ছিল না।" তিনি বালককে শিষ্য করিয়া লইয়াছিলেন। শ্রীকণ্ঠবাবু রবীন্দ্রনাথকে এক একটি গান শিখাইয়া তাঁহার মুখে সকলকে শুনাইবার জন্য ঘরে ঘরে টানিয়া লইয়া বেড়াইতেন। রবীন্দ্রনাথ গান করিতেন আর তিনি সেতারে ঝংকার দিতেন।

যদু ভট্ট নামে একজন বড় ওস্তাদ এক সময় ঠাকুরবাড়িতে আসিলেন। তাঁহার মুখ হইতে শুনিয়াই অনেক গান কবির শেখা হইয়া গেল। তিনি লিখিয়াছেন ঃ

> "আমাদের পরিবারে শিশুকাল হইতে গান চর্চার মধ্যেই আমরা বাড়িয়া উঠিয়াছি। আমার পক্ষে তাহার একটা সুবিধা এই হইয়াছিল, অতি সহজেই গান আমার সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল।"

গানের চর্চায় পিতার কাছেও কবি বিশেষ উৎসাহ পাইয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, "রবি আমাদের বাংলা দেশের বুলবুল।"

একবার মাঘোৎসব উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ কতকগুলি গান রচনা করিয়াছিলেন। খবর পাইয়া মহর্ষি ডাক দিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে হারমোনিয়মে বসাইয়া কবি একে একে সব কয়টি গান বাবাকে শুনাইলেন। গান গাওয়া শেষ হইলে মহর্ষি বলিলেন, "দেশের রাজা যদি দেশের ভাষা জানিত ও সাহিত্যের আদর বুঝিত তবে কবিকে তো তাহারা পুরস্কার দিত। রাজার দিক হইতে যখন তাহার কোনো সম্ভাবনা নাই তখন আমাকেই সে কাজ করিতে হইবে।" এই বলিয়া তিনি একটি পাঁচ-শ টাকার চেক ছেলের হাতে দিলেন।

বিলাতের পড়া

রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন সতের বছর। গান গাহিয়া গান লিখিয়া দিন কাটিয়া যাইতেছে। গুরুজনেরা বালকের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া চিন্তিত হইলেন। ইস্কুল কলেজের পড়া তো হইল না, এখন উপায় কি? শেষ পর্যন্ত ঠিক হইল তাঁহাকে বিলাতে ব্যারিস্টারি পড়িতে পাঠানো হইবে।

কবির মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ ভারতের প্রথম সিভিলিয়ান। তিনি তখন আমেদাবাদের জজ। সবরমতী নদীর ধারে জজসাহেবের বিরাট বাড়ি। বাড়ি তো নয় মোগলযুগের একটি ছোটখাট অট্টালিকা। বিলাত যাইবার পূর্বে মেজদাদার কাছে ইংরাজী ভাষাটা ভাল করিয়া শিখিয়া লইবার জন্য কবিকে সেখানে পাঠানো হইল। সত্যেন্দ্রনাথের স্ত্রী এবং তাঁহার ছেলে মেয়ে তখন বিলাতে। দুপুর বেলা সত্যেন্দ্রনাথ আদালতে চলিয়া গেলে কবি একলা তাঁহার লাইব্রেরিতে বসিয়া বসিয়া ইংরাজী বই পড়েন। গান, প্রবন্ধ এবং কবিতা লেখারও বিরাম নাই।

১৮৭৮-এর সেপ্টেম্বর মাসে কবি মেজদাদার সঙ্গে জাহাজে চড়িলেন। ইংলণ্ডে পেঁাছিয়াই গেলেন ব্রাইটনে।

মেজবউঠান জ্ঞানদানন্দিনী তাঁহার ছেলে সুরেন্দ্রনাথ ও মেয়ে ইন্দিরাকে লইয়া সেখানে বাস করিতেছিলেন। কবি

তাঁহার কাছেই গিয়া উঠিলেন। বউঠাকরুনের যত্নে এবং ছেলেদের উৎপাত-উপদ্রবের আনন্দে কয়েকটা দিন বেশ কাটিয়া গেল। তাহার পর একদিন মেজদাদা সেখানকার একটা পাবলিক স্কুলে ভরতি করিয়া দিলেন। সে স্কুলের ছেলেরা বড় ভদ্র ছিল। সকলেই তাঁহার সঙ্গে মধুর ব্যবহার করিত।

কিন্তু এ ইস্কুলেও তাঁহার বেশীদিন পড়া চলিল না। মেজদাদার বন্ধু তারক পালিত তখন বিলাতে ছিলেন। তিনি কবিকে ব্রাইটন হইতে লইয়া গিয়া লণ্ডন ইউনিভার্সিটিতে ভরতি করিয়া দিলেন।

ডাক্তার স্কট নামক এক ভদ্র গৃহস্থের বাড়িতে তাঁহার থাকিবার স্থান হইল। অতি অল্পদিনের মধ্যেই কবি তাঁহাদের ঘরের লোকের মত হইয়া গেলেন। স্কট সাহেবের স্ত্রী তাঁহাকে ছেলের মত স্নেহ করিতেন। তাঁহার মেয়েরা কবিকে এমন যত্ন করিতেন যাহা আত্মীয়ের কাছেও সর্বদা পাওয়া যায় না।

বিলাতে দেড় বছর কাটাইয়া কবি দেশে ফিরিয়া আসিলেন। পড়াশোনা কিছু হইল বটে কিন্তু সেও নিতান্ত অনিয়মের পড়া। অভিভাবকেরা যে উদ্দেশ্যে বিলাত পাঠাইয়াছিলেন সে উদ্দেশ্য সফল হইল না।

বিলাতে থাকিতে লেখা বেশী হয় নাই। বাড়িতে ফিরিয়া আবার সাহিত্য ও সংগীতের চর্চায় মন দিলেন। 'বাল্মীকি-প্রতিভা' নামক গীতিনাট্যখানি এই সময়ে রচিত হয়।

রবীন্দ্রনাথের বিলাত যাইবার আগে হইতে ঠাকুরবাড়িতে বিদ্বজ্জন সমাগম নামে সাহিত্যিকদের এক সম্মিলন হইত। সেই সম্মিলনে গীতিবাদ্য ও কবিতা আবৃত্তির আয়োজন থাকিত। কবি দেশে ফিরিলে একবার এই সম্মিলনের অনুষ্ঠান হয়। সেই উপলক্ষে 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র অভিনয় হইয়াছিল। কবি বাল্মীকি সাজিয়াছিলেন এবং তাঁহার ভাইঝি প্রতিভা সাজিয়াছিলেন সরস্বতী। বাল্মীকি-প্রতিভা নামের মধ্যে সেই ইতিহাসটি আছে। 'কালমৃগয়া' নামে আর একটি গীতিনাট্য এই সময় লেখা হয়।

সাহিত্য সংগীত অভিনয়ের মধ্য দিয়া বেশ দিন কাটিতেছিল। কিন্তু অভিভাবকেরা আবার বাধা দিলেন। স্থির হইল ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য আবার তাঁহাকে বিলাত যাইতে হইবে। এবার সঙ্গী হইলেন ভাগনে সত্যপ্রসাদ।

কলিকাতা হইতেই দুজনে জাহাজে উঠিলেন। কিন্তু দৈবের নির্বন্ধ। সত্যপ্রসাদ জাহাজে উঠিয়াই অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। মাদ্রাজ হইতেই দুইজনকে ফিবিতে হইল।

নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এবং তাঁহার স্ত্রী এই সময়ে চন্দননগরে গঙ্গার ধারে এক বাগানবাড়িতে বাস করিতেন। সে বাড়িটাকে লোকে বলিত মোরান সাহেবের বাগান। কবি আসিয়া সেখানে আশ্রয় লইলেন। বাড়ির উপরতলায় চারিদিক খোলা একটি গোল ঘর ছিল। সেইখানে বসিয়া রবীন্দ্রনাথ আপন মনে কবিতা লিখিতেন। এই ঘরের কথা মনে করিয়াই কবি লিখিয়াছিলেন ঃ

অনন্ত এ আকাশের কোলে
টলমল মেঘের মাঝার—
এইখানে বাঁধিয়াছি ঘর
তোর তরে কবিতা আমার।

তাঁহার 'সন্ধ্যা সংগীতে'র অধিকাংশ কবিতাই এখানে লেখা। কবির বয়স তখন কুড়ি। কবি বলেন, ''সন্ধ্যা সংগীতেই আমার কাব্যের প্রথম পরিচয়''। একমাত্র ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী ছাড়া সন্ধ্যা সংগীতের আগেকার সব লেখাকে কবি বর্জন করিয়াছেন। তাঁহাব ধারণা সেগুলো নিতান্তই কাঁচা লেখা।

সন্ধ্যাসংগীত বাহির হইলে কবি হিসাবে রবীন্দ্রনাথের নাম বিশেষভাবে ছড়াইয়া পড়ে। এই সময় ঔপন্যাসিক রমেশচন্দ্র

দত্তের বড় মেয়ের বিবাহ হয়। বিবাহ সভায় দ্বারের কাছে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দাঁড়াইয়া ছিলেন। রমেশ বাবু বঙ্কিম বাবুর গলায় মালা পরাইতে যাইতেছেন এমন সময় রবীন্দ্রনাথ সেখানে পেঁাছিলেন। বঙ্কিম বাবু তাড়াতাড়ি সে মালা কবির গলায় পরাইয়া দিয়া বলিলেন. "এ মালা ইঁহারই প্রাপ্য। রমেশ, তুমি সন্ধ্যা সংগীত পড়িয়াছ?" তিনি বলিলেন, "না"। তখন বঙ্কিমচন্দ্র সন্ধ্যাসংগীতের কবিতাগুলির বিশেষ প্রশংসা করিলেন।

গঙ্গার ধারে বসিয়া অনেকগুলি গদ্য প্রবন্ধও লেখা হয়। 'বউঠাকুরানীর হাট' নামক উপন্যাসটির রচনাও আরম্ভ হয় এইখানেই।

চন্দননগর হইতে ফিরিয়া জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সদরস্ট্রীটের এক ভাড়া বাড়িতে কিছুদিন বাস করেন। কবিও তাঁহাদের সঙ্গে ছিলেন। 'প্রভাত সংগীত'-এর অনেক কবিতাই সদরস্ট্রীটের বাড়িতে বসিয়া লেখা। এখানে থাকিতে থাকিতে কবি এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা লাভ করিলেন। জীবনে সে এক আশ্চর্য অনুভূতি।

সদরস্ট্রীটের রাস্তাটা যেখানে গিয়া শেষ হইয়াছে সেইখানে ফ্রী স্কুল স্ট্রীটের বাগানের গাছ দেখা যায়। একদিন সকালে বারান্দায় দাঁড়াইয়া কবি সেইদিকে চাহিলেন। তখন সেই গাছগুলির ডালপালার মধ্য দিয়া সূর্যোদয় হইতেছিল।

চাহিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ তাঁহার চোখের উপর হইতে যেন একটা পর্দা সরিয়া গেল। তাঁহার মনে হইল সমস্ত পৃথিবীতে যেন আনন্দের বন্যা বহিয়া যাইতেছে। সে আনন্দের তরঙ্গ তাঁহার হৃদয়কেও তরঙ্গিত করিয়া তুলিল। সেদিন সমস্ত দুপুর ও বিকাল ধরিয়া তিনি যে কবিতাটি লিখিলেন তাহার নাম 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'। এই কবিতায় তাঁহার সেদিনকার হৃদয়ের ভাব অনেকটা প্রকাশ পাইয়াছে ঃ

আজি এ প্রভাতে রবির কর
কেমনে পশিল প্রাণের 'পর,
কেমনে পশিল গুহার আঁধারে
প্রভাত-পাখির গান।
না জানি কেন রে এতদিন পরে
জাগিয়া উঠিল প্রাণ।

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে

সদর স্ট্রীট হইতে জ্যোতিদাদা ও বউঠান গেলেন কারোয়ারে। কবিও তাঁহাদের সঙ্গী হইলেন। কারোয়ার ভারতের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত। কর্ণাটের বড় নগর। সত্যেন্দ্রনাথ এখানে বদলি হইয়া আসিয়াছিলেন।

শৈলমালায় ঘেরা সমুদ্রের তীরবর্তী এই স্থানটি কবির খুব ভাল লাগিল। কাব্য রচনার পক্ষে জায়গাটি খুব অনুকূল। এখানে বসিয়া কবি গদ্য পদ্য অনেক রচনা লিখিলেন।

'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নামক নাট্যকাব্যটি এই কারোয়ারেই লিখিত হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের কাব্যের যেটি মূল কথা তাহা এই 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' কাব্যে বলা হইয়াছে।— ভগবান্‌কে পাইতে হইলে সংসারের বন্ধন ছিন্ন করিতে হইবে না। মানুষের মধ্যেই ভগবানের প্রকাশ। মানুষকে ভালবাসিলেই ভগবানকে ভালবাসা হয়। স্নেহ প্রেম মায়া মমতা তাঁহাকে পাওয়ার পথে অন্তরায় নয়।

কারোয়ার হইতে ফিরিয়া আসার কিছুদিন পরেই রবীন্দ্রনাথের বিবাহ হয়। তখন তাঁহার বয়স বাইশ বৎসর সাত মাস।

এই সময় কবি জ্যোতিদাদাদের সঙ্গে চৌরঙ্গীর কাছাকাছি সার্কুলার রোডের একটি বাগানবাড়িতে বাস করিতেন। এই বাড়ির দক্ষিণের দিকে মস্ত একটা বস্‌তি ছিল। কবি দোতলার

একটি জানালার কাছে বসিয়া সেই লোকালয়ের দৃশ্য দেখিতেন। তাহাদের সমস্ত দিনের কাজকর্ম, তাহাদের বিশ্রাম, তাহাদের খেলাধুলা, তাহাদের যাওয়া আসা—দেখিতে তাঁহার ভারী ভাল লাগিত। সে যেন তাঁহার কাছে বিচিত্র গল্পের মত মনে হইত।

এই সময় যে কবিতাগুলি লেখা হয় সেগুলিই 'ছবি ও গান' নাম ধরিয়া পরের বৎসর প্রকাশিত হয়।

'ছবি ও গান' বাহির হয় ১৮৮৪ সালে। ইহার এক বছর পরে ঠাকুরবাড়ি হইতে 'বালক' নামে একটি পত্রিকা বাহির হইল। পত্রিকার সম্পাদক হইলেন কবির মেজ বউ-ঠাকরুন জ্ঞানদানন্দিনী দেবী। তাঁহার ইচ্ছা ছিল ঠাকুরবাড়ির বালকেরা এই কাগজে আপন আপন রচনা প্রকাশ করিবে। কিন্তু শুধু তাহাদের লেখায় কাগজ চলিতে পারে না জানিয়া তিনি রবীন্দ্র-নাথকেও রচনার ভার লইতে বলিলেন। তাঁহার রাজর্ষি গল্পটি এই কাগজেই মাসে মাসে বাহির হইয়াছিল। এই রাজর্ষির গল্পাংশ লইয়াই পরে 'বিসর্জন' নাটক রচিত হয়।

'বালকে'র সঙ্গে সঙ্গে 'ভারতী' পত্রিকাতেও লেখা চলিতেছে। হিন্দুধর্ম লইয়া পুরাতনপন্থী এবং সংস্কার-পন্থীদের মধ্যে একটা প্রবল আন্দোলন এই সময় দেখা দেয়। উভয় পক্ষই আপন আপন মত সমর্থন করিয়া প্রবন্ধ প্রকাশ করিতেছেন। সংস্কারকদলের পক্ষে রবীন্দ্রনাথের লিখিত গদ্য পদ্য অনেক রচনা এই সময় বাহির হয়।

এইভাবে জীবনটা বেশ একরকম চলিতেছিল কিন্তু হঠাৎ মৃত্যু আসিয়া একটা গুরুতর আঘাত হানিয়া গেল। কবির বয়স তখন চব্বিশ বৎসর। মায়ের স্নেহ ভগ্নীর আদর বন্ধুর প্রীতি দিয়া যিনি মাতৃহারা দেবরটির সকল ভার লইয়াছিলেন সেই নোতুন বউঠান চিরবিদায় লইলেন।

কবি জানিতেন সমস্ত জীবনটাই হাসিকান্নায় নিরেট করিয়া বোনা, তাহার মধ্যে কোথাও এতটুকু ফাঁক নাই। বউ-ঠানকে হারাইয়া মনে হইল সে তো সত্য নয়। জীবনের একটা জায়গা যে নিতান্তই শূন্য হইয়া গেল।

কিছুদিন কাটিল দুঃসহ দুঃখের মধ্য দিয়া। ধীরে ধীরে সেই মৃত্যুশোকও তিনি জয় করিয়া উঠিলেন। এমনি করিয়া আরও বছর দেড়েক কাটিয়া গেল।

১৮৮৬ সালে 'কড়ি ও কোমল' নামক কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হইল। কবির বয়স তখন পঁচিশ। 'কড়ি ও কোমলে' কবি সেই কথা প্রথম বলিয়াছেন যাহা তাঁহার পরবর্তী সকল কাব্যের মর্মকথা—

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।

জমিদারি

বাল্যকাল হইতেই কবির পশ্চিম ভারতের কোনো জায়গায় গিয়া কিছুদিন বাস করিবার ইচ্ছা ছিল। সে ইচ্ছা একদিন পূর্ণ হইল। কবি সপরিবারে গাজিপুর চলিলেন। গাজিপুরে যাইবার প্রধান কারণ কবি শুনিয়াছিলেন সেখানে গোলাপের খেত আছে। সেই গোলাপবাগানের মোহ কবির মনকে টানিয়াছিল। কিন্তু কল্পনায় যে ছবি আঁকিয়াছিলেন সেখানে গিয়া দেখিলেন আসলের সঙ্গে তাহার মিল নাই। দেখিলেন ব্যবসাদারের গোলাপ খেত। তবু এখানেই রহিয়া গেলেন।

একটি বড় বাড়ি পাওয়া গেল। গঙ্গার ধারেও বটে আবার ঠিক ধারেও নয়। প্রায় মাইলখানেক চর পড়িয়া গিয়াছে। সেখানে যবের ছোলার সরিষার খেত। দূর হইতে দেখা যায় গঙ্গার জলধারা, গুণটানা নৌকা চলিতেছে মন্থর গতিতে। নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে গোলোক চাঁপার গাছ হইতে কোকিলের ডাক আসিতেছে। সাদা ধুলার রাস্তা চলিয়া গিয়াছে বাড়ির গা ঘেঁষিয়া, দূরে দেখা যায় খোলার চালওয়ালা পল্লী।

কবির কল্পনার উপর নূতন পরিবেশের আশ্চর্য প্রভাব দেখা যায়। পরিচিত জায়গা হইতে যখনই একটু দূরে গিয়াছেন তখনই তাঁহার রচনার ধারাও নূতন খাতে বহিয়াছে। এখানেও তাহাই হইল। নূতন আবহাওয়ায় কাব্যরচনার

একটা নূতন পর্ব প্রকাশ পাইল। 'মানসী'র কবিতায় তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। মানসী কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হয় অবশ্য অনেক পরে। কিন্তু তাহার অনেকগুলি কবিতা এই সময় লেখা হয়। এই সকল কবিতায় ছন্দ লইয়া কবি অনেক নূতন নূতন পরীক্ষা করিয়াছেন।

গাজিপুর হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া লিখিলেন 'মায়ার খেলা'। মায়ার খেলা গীতিনাট্য। কিন্তু ইহার নাট্য-অংশ গৌণ, গীতিটাই মুখ্য।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম নাটক 'রাজা ও রানী'। এটি তাঁহার আঠাশ বছর বয়সের রচনা। সত্যেন্দ্রনাথ তখন সপরিবারে সোলাপুরে ছিলেন। কবিও স্ত্রী এবং দুইটি শিশুকে লইয়া গরমের সময় মাসখানেক মেজদাদার কাছে কাটাইয়া আসেন। এই সোলাপুরে থাকিতে থাকিতেই নাটকটি লেখা হয়। রাজা ও রানী কাব্য নাটক। ইহারই কাহিনী লইয়া কবি চল্লিশ বৎসর পরে 'তপতী' নামে একটি গদ্য নাটক লিখেন।

লিখিয়া পড়িয়া গান গাহিয়া এতদিন সময় কাটিতেছিল। সংসারের কোনো দায় তখনও তাঁহার ঘাড়ে পড়ে নাই। কিন্তু এবার বিষয় কর্মের ভার লইতে হইল। মহর্ষি তাঁহাকে উত্তরবঙ্গে ও শিলাইদহে জমিদারি তদারক করিতে পাঠাইলেন। জীবনে এ তাঁহার এক নূতন অভিজ্ঞতা। পদ্মার চরে নৌকা বাঁধিয়া দিন কাটান। প্রকৃতির সঙ্গে এমন অন্তরঙ্গ যোগ

তাঁহার কখনোই হয় নাই। এদিকে পল্লীর মানুষকেও তিনি নিকট হইতে দেখিলেন। পল্লী বাংলার সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ-পরিচয় হইল।

জমিদারির কাজে সাহাজাদপুরে অবস্থানের সময় 'বিসর্জন' নাটকটি রচিত হয়। এটি যে রাজর্ষি উপন্যাসের ঘটনা লইয়া লেখা সে কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। সাহাজাদপুর যাত্রার সময় কবির ভাইপো সুরেন্দ্রনাথ নিজের হাতে একটি খাতা বাঁধিয়া কাকার হাতে দিয়াছিলেন। সেই খাতায় বিসর্জন লেখা হইল। বাঁধানো খাতাটি যিনি উপহার দিয়াছিলেন খাতার লেখাটি কবি তাঁহার নামেই উৎসর্গ করিলেন ঃ

তোরি হাতে বাঁধা খাতা তারি শ-খানেক পাতা
অক্ষরেতে ফেলিয়াছি ঢেকে.
মস্তিষ্ক কোটরবাসী চিন্তাকীট রাশি রাশি
পদচিহ্ন গেছে যেন রেখে।
প্রবাসে প্রত্যহ তোরে হৃদয়ে স্মরণ করে
লিখিয়াছি নির্জন প্রভাতে.
মনে করি অবশেষে শেষ হলে ফিরে দেশে
জন্মদিনে দিব তোর হাতে।

বিসর্জন প্রকাশিত হইল বাংলা ১২৯৭ সালে (ইং ১৮৯০), কবির বয়স তখন উনিশ। এই সময় খবর পাইলেন মেজদাদা ছুটি লইয়া বিলাত যাইতেছেন। কবির বন্ধু লোকেন পালিতও

তাঁহার সঙ্গে যাইতেছেন। জমিদারির কাজে মন বসিতেছিল না, কবি তাঁহাদের সঙ্গে বিলাত যাত্রা করিলেন। যাতায়াতের পথে জাহাজেই মাস দেড়েক কাটিয়া গেল, বিলাতে মাস খানেক। আড়াই মাস পরেই আবার বাড়ি ফিরিয়া আসিলেন। এই আড়াই মাস ধরিয়া যে রোজনামচা লিখিলেন তাহাই 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি' নামে গ্রন্থাকারে বাহির হয়।

বিলাত হইতে ফিরিয়া আসেন ১৮৯০-এর নভেম্বরে, ঐ বৎসরের ডিসেম্বর মাসেই 'মানসী' প্রকাশিত হয়। গত তিন বছর ধরিয়া যত কবিতা লেখা হইয়াছিল সেগুলি মানসীতে একত্র করা হইয়াছিল।

'মানসী'র প্রথম কবিতার নাম উপহার। উহারই প্রথম স্তবকটি তুলিয়া দিলাম ঃ

নিভৃত এ চিত্তমাঝে নিমেষে নিমেষে বাজে
জগতের তরঙ্গ-আঘাত

ধ্বনিত হৃদয়ে তাই মুহূর্ত বিরাম নাই
নিদ্রাহীন সারা দিনরাত।

সুখদুঃখ গীতস্বর ফুটিতেছে নিরন্তর,
ধ্বনি শুধু, সাথে নাই ভাষা:

বিচিত্র সে কলরোলে ব্যাকুল করিয়া তোলে
জাগাইয়া বিচিত্র দুরাশা।

জমিদারি

এ চিরজবন তাই আর কিছু কাজ নাই
রচি শুধু অসীমের সীমা;
আশা দিয়ে ভাষা দিয়ে তাহে ভালোবাসা দিয়ে
গড়ে তুলি মানসী প্রতিমা।

চৈতালি

জমিদারি দেখিবার উপলক্ষে জনসাধারণের সঙ্গে মিশিবার যে সুযোগ পাইলেন তাহা কাজে লাগিল। এই সময় কলিকাতায় 'হিতবাদী' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা বাহির হয়। কবি তাহার জন্য ছোট গল্প লিখিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার দেখা বাংলা দেশই এই গল্পগুলিতে রূপ লাভ করিয়াছে। হিতবাদীতে তিনি পর পর ছয়টি মাত্র গল্প লিখিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার পর 'সাধনা' পত্রিকায় তাহার জের চলিয়াছিল। 'সাধনা' পত্রিকা বাহির করেন ভাইপোরা। সম্পাদক হন সুধীন্দ্রনাথ—বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথের পুত্র। সাধনা বাহির হয় ১২৯৮-এর অগ্রহায়ণ মাসে।

কবির লেখা ছোট গল্পের সংখ্যা নব্বইয়ের কাছাকাছি। ছোটগল্প লিখিয়া কবি যে আনন্দ পাইতেন সে কথা অনেকবার বলিয়াছেন। ''আমি বাস্তবিক ভেবে পাইনে কোনটা আমার আসল কাজ। এক এক সময় মনে হয় আমি ছোটগল্প অনেক লিখতে পারি এবং মন্দ লিখতে পারি না। লেখবার সময় সুখও পাওয়া যায়।'' ঐ সময়কার একটি চিঠিতে লিখেন, ''আজকাল মনে হচ্ছে, যদি—আমি আর কিছুই না করে ছোট ছোট গল্প লিখতে বসি তাহলে কতকটা মনের সুখে থাকি এবং কৃতকার্য হতে পারলে পাঁচজন পাঠকেরও মনের সুখের কারণ হওয়া যায়।''

কবির গল্পে বাস্তব ঘটনার অনেক ছবি আছে কিন্তু তাঁহার হাতে পড়িয়া সেগুলি নূতন রসে রসান্বিত হইয়া উঠিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ নিজের লেখা কোনো কোনো গল্পের নাট্যরূপ দিয়াছেন। 'একটি আষাঢ়ে গল্প' নামে কবির একটি বিখ্যাত গল্প আছে। তাহাকে অবলম্বন করিয়া কবি 'তাসের দেশ' নাটক লিখেন। বর্তমানে কবির অনেক গল্প সিনেমায় চিত্র-রূপ লাভ করিয়াছে। কাবুলিওআলা, ক্ষুধিতপাষাণ, খোকা-বাবুর প্রত্যাবর্তন—এগুলি অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন।

জমিদারির কাজে শুধু উত্তরবঙ্গ নয় উড়িষ্যা পর্যন্ত কবিকে ঘোরাঘুরি করিতে হইতেছে।

ইতিমধ্যে 'গোড়ায় গলদ' নামক প্রহসন নাটকটি লেখা হইয়াছে। ভারতীয় সংগীতসমাজের উদ্‌যোগে তাহার অভি-নয়ও হইয়া গেল। কবি নিজেই মহড়ায় উপস্থিত থাকিয়া অভিনেতাদের অভিনয় শিক্ষা দিলেন।

এইখানে একটা কথা বলিয়া রাখি। কবি নিজে একজন সুনিপুণ অভিনেতা ছিলেন একথা অনেকে জানেন। বিসর্জন নাটকে রঘুপতি এবং জয়সিংহ এই দুইটি চরিত্রেই তিনি অভিনয় করিয়াছিলেন। কিশোর বয়সে 'বাল্মীকি-প্রতিভা'য় বাল্মীকির অংশ লইয়াছিলেন। অভিনয় শিক্ষাদানেও তিনি পারদর্শী ছিলেন। শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা যে সব নৃত্যনাট্য গীতিনাট্য ইত্যাদি অভিনয় করানো হইত তাহার সব-

গুলির মহড়া কবি নিজে বসিয়া দেওয়াইতেন। পুরাপুরি তৈয়ারী না হইলে তিনি কখনো তাঁহার নাটক অভিনয় করিতে দেন নাই। শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীদের অভিনয়ে পার্ট ধরাইয়া দিবার জন্য কখনো স্মারক বা প্রম্পটার থাকে না।

জমিদারির কাজে ঘুরিতে ঘুরিতে আর একটি কবিতার বই লেখা হইল নাম 'চৈতালি'। চৈতালি কাব্যে অনেকগুলি বিখ্যাত কবিতা আছে। 'বঙ্গমাতা', 'দেবতার বিদায়', 'বৈরাগ্য', 'খেয়া', 'দুর্লভ জন্ম', 'সভ্যতার প্রতি'—এ সব চৈতালির কবিতা।

পতিসরের নাগর নদীতে তখন কবির বোট বাঁধা। নদীটি বেশী চওড়া নয়, তাহার স্রোতও ক্ষীণ। কবি বলিয়াছেন,

> "তাহার এক তীরে দরিদ্র লোকালয়, গোয়ালঘর, ধানের মরাই, বিচালির স্তূপ, অন্য তীরে বিস্তীর্ণ ফসলকাটা শস্যখেত ধূ ধূ করছে। কোনো এক গ্রীষ্মকালে এই-খানে আমি বোট বেঁধে কাটিয়েছি। দুঃসহ গরম। মন দিয়ে বই পড়বার মত অবস্থা নয়। বোটের জানলা বন্ধ করে খড়খড়ি খুলে সেই ফাঁকে দেখছি বাইরের দিকে চেয়ে।"

সেই দেখার স্মৃতিকে কবি সহজভাষায় গাঁথিয়া রাখিয়াছেন এই কাব্যে। এখানে তাহারই একটি উদাহরণ তুলিয়া দিলাম। কবিতাটির নাম 'পরিচয়'।

একদিন দেখিলাম উলঙ্গ সে ছেলে
ধূলি'পরে বসে আছে পা দুখানি মেলে।

চৈতালি

ঘাটে বসি মাটি ঢেলা লইয়া কুড়ায়ে
দিদি মাজিতেছে ঘটি ঘুরায়ে ঘুরায়ে।
অদূরে কোমল-লোম ছাগবৎস ধীরে
চরিয়া ফিরিতেছিল নদী তীরে তীরে।

সহসা সে কাছে আসি থাকিয়া থাকিয়া
বালকের মুখ চেয়ে উঠিল ডাকিয়া।
বালক চমকি কাঁপি কেঁদে ওঠে ত্রাসে
দিদি ঘাটে ঘটি ফেলি ছুটে চলে আসে।

এক কক্ষে ভাই লয়ে অন্য কক্ষে ছাগ
দু-জনেরে বাঁটি দিল সমান সোহাগ।
পশুশিশু, নরশিশু—দিদিমাঝে পড়ে
দোঁহারে বাঁধিয়া দিল পরিচয়-ডোরে।

'চৈতালি'র আগেই প্রকাশিত হইয়াছে 'চিত্রা' কাব্য। এই কাব্যে কবির কয়েকটি শ্রেষ্ঠ কবিতা বাহির হইয়াছিল। 'উর্বশী', 'জীবনদেবতা', 'বিজয়িনী', 'স্বর্গ হইতে বিদায়' প্রভৃতি কবিতা এই গ্রন্থের অন্তর্গত।

চিত্রা কাব্যের প্রথম কবিতাটির নামও চিত্রা। এই কবিতাটিকে চিত্রা কাব্যের ভূমিকা বলা চলে। কয়েকটি ছত্র উদ্ধৃত করি ঃ

জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
তুমি বিচিত্ররূপিণী।

অযুত আলোকে ঝলসিছ নীল গগনে,
আকুল পুলকে উলসিছ ফুল কাননে,
দ্যুলোক ভূলোকে বিলসিছ চল-চরণে,
তুমি চঞ্চলগামিনী।

... .. .

জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
তুমি বিচিত্ররূপিণী।
অন্তরমাঝে তুমি শুধু একা একাকী
তুমি অন্তর-ব্যাপিনী।

এই সময় কবি একটি নাটিকা রচনা করিলেন তাহার নাম 'মালিনী'। মালিনী নাটিকার উৎপত্তির একটি কৌতুকজনক ইতিহাস আছে। কবি বিলাতে অবস্থানকালে একদিন রাত্রে স্বপ্ন দেখেন যেন তাঁহার সম্মুখে একটি নাটকের অভিনয় হইতেছে। সেই নাটকেব কাহিনী অবলম্বন করিয়াই তাঁহার 'মালিনী' নাটিকা রচিত হইল।

বাংলার মাটি বাংলার জল

উনবিংশ শতাব্দী শেষ হইয়া বিংশ শতাব্দী আসিয়া পড়িল। গল্পে কবিতায় প্রবন্ধে নাটকে প্রহসনে বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারকে রবীন্দ্রনাথ পূর্ণ করিয়া চলিয়াছেন। তাঁহার রচনায় বাংলা দেশের মন গঠিত হইয়া উঠিয়াছে। প্রাচীন ভারতের আদর্শকে তিনি এ যুগের মানুষের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন। 'নৈবেদ্য' কাব্য প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথের চল্লিশ বৎসর বয়সে। এই কাব্যের অনেক কবিতায় কবি প্রাচীন ভারতের মহিমা কীর্তন করিয়াছেন। একটি কবিতা ঐ গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করি ঃ

হে ভারত, নৃপতিরে শিখায়েছ তুমি
ত্যাজিতে মুকুট দণ্ড সিংহাসন ভূমি,
ধরিতে দরিদ্র বেশ; শিখায়েছ বীরে
ধর্মযুদ্ধে পদে পদে ক্ষমিতে অরিরে;
ভুলি জয় পরাজয় শর সংহরিতে।
কর্মীরে শিখালে তুমি যোগযুক্ত চিতে
সর্বফলস্পৃহা দিতে ব্রহ্মে উপহার।
গৃহীরে শিখালে গৃহ করিতে বিস্তার
প্রতিবেশী আত্মবন্ধু অতিথি অনাথে।
ভোগেরে বেঁধেছ তুমি সংযমের সাথে,

নির্মল বৈরাগ্যে দৈন্য করেছ উজ্জ্বল,
সম্পদেরে পুণ্যকর্মে করেছ মঙ্গল,
শিখায়েছ স্বার্থ ত্যজি সর্ব দুঃখে সুখে
সংসার রাখিতে নিত্য ব্রহ্মের সম্মুখে।

এই সময়ে (১৯০১) প্রাচীন ভারতবর্ষের তপোবনের আদর্শে কবি শান্তিনিকেতনে বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রম নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। সেই বিদ্যালয়ই আজ বিশ্ব-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছে। আজিকার বিশ্ব-ভারতীর রূপ দেখিয়া সেদিনকার বিদ্যালয়ের অবস্থা কল্পনা করা অসম্ভব।

জমিদারির অবস্থা খারাপ। কবির ভাগে যাহা পড়ে তাহাতে সংসার খরচই চলে না। অথচ বিদ্যালয়ের সকল ব্যয় তাঁহাকে একলাই বহন করিতে হয়। পুরীর সমুদ্রতীরে কবির একটি বাড়ি ছিল সেটি বেচিয়া ফেলিতে হইল। বিষয় সম্পত্তি যাহা ছিল সবই গেল। কবির পত্নী মৃণালিনী দেবী হাসিমুখে গায়ের গহনাগুলি খুলিয়া দিলেন। এমনি করিয়া অতি কষ্টে বিদ্যা-লয়ের শৈশবের দিনগুলি কাটিতেছিল। হঠাৎ মৃণালিনী দেবীর মৃত্যু হইল। কবি যে বেদনা পাইলেন তাহা 'স্মরণ' গ্রন্থে কবিতাকারে স্থায়ীরূপ পাইয়াছে।

'স্মরণ' গ্রন্থ হইতে একটি কবিতা এখানে উদ্ধৃত করি :

ঘরে যবে ছিলে মোরে ডেকেছিলে ঘরে
তোমার করুণাপূর্ণ সুধাকণ্ঠ-স্বরে।

আজ তুমি বিশ্বমাঝে চলে গেলে যবে
বিশ্বমাঝে ডাকো মোরে সে করুণ রবে।
খুলি দিয়া গেলে তুমি যে গৃহদুয়ার
সে দ্বার রুধিতে কেহ কহিবে না আর।
বাহিরের রাজপথ দেখালে আমায়,
মনে রয়ে গেল তব নিঃশব্দ বিদায়।
আজি বিশ্বদেবতার চরণ-আশ্রয়ে
গৃহলক্ষ্মী দেখা দাও বিশ্বলক্ষ্মী হয়ে।
নিখিল নক্ষত্র হতে কিরণের রেখা
সীমন্তে আঁকিয়া দিক সিন্দুরের লেখা।
একান্তে বসিয়া আজি করিতেছি ধ্যান
সবার কল্যাণে হোক তোমার কল্যাণ।

কবি জীবনে অনেক শোক অনেক বেদনা পাইয়াছেন। কিন্তু কোনো আঘাতেই কখনো বিচলিত হইয়া পড়েন নাই।

মৃণালিনী দেবীর মৃত্যুর পর এক বছর যাইতে না যাইতেই কন্যা রেণুকার মৃত্যু হইল। তাহার দুই বছর পরে ১৯০৫ সালে মহর্ষি দেহ রক্ষা করিলেন। ১৯০৭-এ কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রও তাঁহাকে ছাড়িয়া গেল।

মৃণালিনী দেবীর মৃত্যু হইলে রেণুকা ও শমীন্দ্রকে লইয়া কবি আলমোড়ায় গিয়াছিলেন। মাতৃহীন এই দুইটি ছেলে-মেয়ের জন্য অনেকগুলি কবিতা সেখানে রচনা করেন। ‘শিশু’ গ্রন্থে সেই কবিতাগুলি আছে।

রবীন্দ্রনাথ ভাববিলাসী কবি ছিলেন না। দেশের মানুষের সুখদুঃখের কথা তিনি চিন্তা করিতেন। ১৯০৫ সালে তখনকার ইংরাজ সরকার বাংলা দেশকে দুই ভাগে ভাগ করিয়া দিলেন। বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে দেশে গুরুতর আন্দোলন উপস্থিত হইল। বাংলা দেশের জনসাধারণ বিলাতী জিনিস বয়কট করিল। এই সময়কার রচনাগুলিতে রবীন্দ্রনাথ দেশের সকল সম্প্রদায়ের লোককে ঐক্যবদ্ধ হইবার উপদেশ দিলেন। অনেকগুলি বিখ্যাত স্বদেশী সংগীত এই যুগের রচনা। সে-দিন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কণ্ঠ মিলাইয়া বাংলা দেশ এক-সুরে গাহিয়াছিল ঃ

ওমা তোর চরণেতে দিলেম এই মাথা পেতে—
দেগো তোর পায়ের ধুলা সে যে আমার
মাথার মানিক হবে।

ওমা, গরিবের ধন যা আছে তাই
দিব চরণতলে,
মরি হায়, হায় রে—

আমি পরের ঘরে কিনব না আর
ভূষণ বলে গলার ফাঁসি॥

বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষেই কবি লিখিলেন ঃ

বাংলার মাটি বাংলার জল,
বাংলার বায়ু বাংলার ফল—

পুণ্য হউক পুণ্য হউক পুণ্য হউক হে ভগবান্।

রাখী উৎসবের প্রবর্তনও হয় এই উপলক্ষে। কলিকাতার রাস্তায় দীর্ঘ শোভাযাত্রার সম্মুখে কবি গাহিয়া চলিয়াছেন, সহস্রকণ্ঠে তাহার প্রতিধ্বনি উঠিয়াছে ঃ

শাসনে যতই ঘেরো আছে বল দুর্বলেরও,
হও-না যতই বড় আছেন ভগবান্।
আমাদের শক্তি মেরে তোরাও বাঁচবিনে রে
বোঝা তোর ভারী হলেই ডুববে তরীখান।

দুর্বলেরও যে বল আছে তাহার প্রমাণ আমরা পাইয়াছি। ভারতবর্ষ স্বাধীন হইয়াছে। দুঃখের কথা কবি তাহা দেখিয়া যাইতে পারেন নাই।

গীতাঞ্জলি

পঁচিশে বৈশাখ বাঙালীর একটি পুণ্য দিন। প্রতি বৎসর এই দিনটিতে আমরা কবির জন্মোৎসব করিয়া থাকি। এই উৎসব আরম্ভ হয় আজ হইতে পঞ্চাশ বৎসর আগে, কবি যে বৎসর ঊনপঞ্চাশ পার হইয়া পঞ্চাশে পড়েন সেই বৎসর—বাংলা ১৩১৭ (ইংরাজী ১৯১০) সালে। ছাত্র ও অধ্যাপকদের উদ্‌যোগে শান্তিনিকেতনেই এই উৎসবের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। 'গীতাঞ্জলি' নামক গান ও কবিতার বই এই বৎসর প্রকাশিত হয়।

১৩১৮ সালের ২৫শে বৈশাখ কবির পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হইলে বেশ সমারোহের সহিত জন্মোৎসব হয়। এই উপলক্ষে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উদ্‌যোগে কলিকাতার টাউন হলে একটি জনসভা আহ্বান করা হইয়াছিল। সেই সভায় দেশ-বাসীর পক্ষ হইতে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কবিকে এক অভি-নন্দন দেন। কবিপ্রতিভার এইরূপ সার্বজনীন স্বীকৃতি এই প্রথম।

ইহার কয়েকদিন পরেই রবীন্দ্রনাথ আবার বিদেশ যাত্রা করিলেন। ইহার আগে কবি দুইবার ইউরোপে গিয়াছিলেন এবার গেলেন আমেরিকায়। আমেরিকায় মাস ছয়েক ছিলেন। ও দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিমন্ত্রণে এই কয়েক মাসে তিনি অনেকগুলি বক্তৃতা করেন।

আমেরিকা হইতে ইংলণ্ডে গেলেন চৈত্র মাসের শেষে

১৯১৩ সালের এপ্রিলে। ইতিমধ্যে ইংলণ্ডে 'গীতাঞ্জলি' কাব্যের ইংরাজী সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। এই বইটি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পশ্চিম দেশে রবীন্দ্রনাথের নাম ছড়াইয়া পড়িল। সে দেশের বড় বড় কবি ও সমালোচকেরা এই গ্রন্থকে সাদর অভিনন্দন জানাইলেন। গীতাঞ্জলি ইউ-রোপে যে সমাদর পাইয়াছিল, কোনো বিদেশী কবির রচনা তেমন সমাদর আগে আর কখনো পায় নাই।

কবি আমেরিকা হইতে লণ্ডনে পেঁাছিলে সেখানে অনেক-গুলি সভায় তাঁহাকে সংবর্ধনা জানানো হয়। গীতাঞ্জলির সমালোচনা করিয়া কেহ কেহ বলেন, এমন মহৎ ভাবের কবিতা ইংরাজী ভাষায় ইহার পূর্বে আর কখনো রচিত হয় নাই।

লণ্ডনে থাকিতে রেভারেণ্ড সি এফ এন্ড্রুজ সাহেবের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হয় এবং এই পরিচয় অল্প দিনের মধ্যেই বন্ধুত্বে পরিণত হয়। ইনি ছিলেন একজন খাঁটি মানুষ। খৃীস্টান পাদ্রীরা অনেক সময় বড় গোঁড়া হইয়া থাকেন। কিন্তু এন্ড্রুজ সাহেবের চরিত্রে গোঁড়ামি ছিল না। তাই কবির সহিত তাঁহাব বিশেষ সৌহার্দ্য হইয়াছিল। ইংলণ্ডে মাস কয়েক কাটাইয়াই কবি শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া আসিলেন।

ইংরাজী গীতাঞ্জলির প্রশংসা ইংলণ্ড হইতে ইউরোপের অন্যান্য দেশেও ছড়াইয়া পড়িল। সুইডিশ অ্যাকাডেমির সভ্যরা এ বই পড়িয়া রবীন্দ্রনাথকে পৃথিবীর মহত্তম কবি

বলিয়া স্বীকার করিয়া তাঁহাকে নোবেল পুরস্কার দিলেন।

রবীন্দ্রনাথের কবিতা অনেক দিন আগে হইতেই শিক্ষিত সমাজে সমাদর পাইয়াছিল। কবির নোবেল পুরস্কার পাওয়ায় তাঁহার সাহিত্যের প্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি আরও বেশী করিয়া পড়িল। শুধু দেশবাসীর নয় বিদেশেরও। গীতাঞ্জলির ইংরাজী সংস্করণ ইউরোপে আমেরিকায় হাজারে হাজারে বিক্রয় হইতে লাগিল। বাংলার কবিকে দেশের লোক বিশ্বকবি বলিয়া অভিহিত করিল।

এই উপলক্ষে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত লিখিলেন ঃ

রবির অর্ঘ্য পাঠায়েছে আজ
ধ্রুবতারার প্রতিবাসী
প্রতিভার এই পুণ্য পূজায়
সপ্তসাগর মিলল আসি।
কোথায় শ্যামল বঙ্গভূমি,—
কোথায় শুভ্র তুষারপুরী—
কি মন্তরে মিলল তবু
অন্তরে কে টানল ডুরি!
কোলাকুলি কালায় গোরায়
প্রাণের ধারায় প্রাণ মেশে
রাজার পূজা আপন রাজ্যে
কবির পূজা সব দেশে।

নোবেল পুরস্কার পাওয়ার বছর তিনেক পরেই ইংরাজ

সরকার তাঁহাকে সার উপাধি দিলেন। ইহার পূর্বে কোনো কবি বা সাহিত্যিকের অদৃষ্টে এত বড় রাজসম্মান জুটে নাই।

ইহার অপেক্ষাও একটি বড় ঘটনা এই সময়েই ঘটে। গান্ধীজি আসেন শান্তিনিকেতনে। কবি ও মহাত্মার এই প্রথম মিলন।

দিন আগত ওই

বিদ্যালয়ের কাজ চলিয়াছে। গদ্য পদ্য লেখারও বিরাম নাই। 'বলাকা' রবীন্দ্রনাথের একটি বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ। এই কাব্যের অনেকগুলি কবিতাও এই সময় লেখা হয়। কবির মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের জামাতা—ভাইঝি ইন্দিরা দেবীর স্বামী —প্রমথ চৌধুরীর নাম বাংলা সাহিত্যে বিশেষ পরিচিত। ইনি 'সবুজ পত্র' নামে একটি পত্রিকা বাহির করিলেন। তাহাতেও কবির অনেক রচনা নিয়মিত বাহির হইতে লাগিল।

এমন সময় জাপান হইতে নিমন্ত্রণ আসিল। ১৯১৩-র অক্টোবরে কবি দেশে ফিরিয়াছিলেন। আড়াই বছর পরে ১৯১৬-এর মে মাসে আবার বাহির হইলেন। জাপানে মাস তিনেক থাকিয়া সেখান হইতে গেলেন আমেরিকায়। সেখানেও প্রায় সাত মাস ঘুরিয়া কাটাইলেন। এই দশ মাসে জাপানে ও আমেরিকায় তিনি ইংরাজী ভাষায় অনেকগুলি বক্তৃতা দিয়াছিলেন।

১৯১৪ হইতে মহাযুদ্ধ বাধিয়াছে। সারা ভারতবর্ষ সে যুদ্ধের আঘাতে চঞ্চল। বিশেষ করিয়া বাংলা দেশ।

স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলা দেশের ছেলেরা চিরকালই অগ্রণী। ইংরাজ রাজপুরুষেরা সে কথা ভাল করিয়াই জানেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় হইতেই তাঁহারা টের পাইয়াছেন

দিন আগত ওই

ইংরাজ রাজশক্তিকে বাংলার যুবসম্প্রদায় প্রীতির দৃষ্টিতে দেখিতেছে না। তাহার ফলও ফলিল। রাজ্য শাসনের নামে অত্যাচারের বন্যা বহিয়া গেল। দেশকে ভালবাসিবার অপরাধে স্বদেশভক্তদিগকে জেলে নির্বাসনে পাঠানো হইতে লাগিল।

কবি যখন দেশে ফিরিলেন তখন দেশে গভীর সংকট। ইংরাজ সরকার ভারত রক্ষা আইন জারি করিয়া বাংলার হাজার বার-শ ছেলেকে আটক করিয়াছেন। কেহ আছে জেলে কাহাকেও বা দূর দূরান্তের গ্রামে নজরবন্দী করিয়া রাখা হইয়াছে। কবি চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। যে রবীন্দ্রনাথ একদিন রাখী হাতে লইয়া পথে নামিয়াছিলেন সেই রবীন্দ্রনাথকে বাঙালী আবার নূতন করিয়া দেখিতে পাইল।

ব্রিটিশ দমননীতির প্রতিবাদে কলিকাতায় জনসভার অনুষ্ঠান হইল। কবি সে সভায় অত্যাচারের নিন্দা করিয়া প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। কবির রচিত গানও এখানে গাওয়া হইল ঃ

দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী,
আসিল যত বীরবৃন্দ আসন তব ঘেরি।
দিন আগত ওই, ভারত তবু কই?
সে কি রহিল লুপ্ত আজি সব জন পশ্চাতে?
লউক বিশ্ব কর্মভার মিলি সবার সাথে।
প্রেরণ কর ভৈরব তব দুর্জয় আহ্বান হে,
জাগ্রত ভগবান হে॥

এই সময় কবির জোড়াসাঁকো বাসভবন বাংলার একটি তীর্থক্ষেত্র হইয়া উঠিল। দেশের বড় বড় নেতা ও কর্মীরা এখানে আসিয়া মিলিত হইতে লাগিলেন। কবির সহিত ভবিষ্যৎ কর্মধারার পরামর্শ চলিতে লাগিল। জাতীয় কংগ্রেস তাঁহার সক্রিয় সহযোগিতায় অধিকতর শক্তিশালী হইয়া উঠিল।

রাজনৈতিক দুর্যোগের ফাঁকে ফাঁকে রচনার কাজও চলিতেছে। ইহারই মধ্যে 'ডাকঘর' নাটিকার অভিনয়ও হইয়া গেল। মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, বালগঙ্গাধর তিলক প্রভৃতি দেশনেতাগণ সে অভিনয় দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলেন।

কলিকাতা ও শান্তিনিকেতনে কবির যাতায়াত চলিতেছে। তবে বেশীর ভাগ শান্তিনিকেতনেই কাটে। বিদ্যালয় তাঁহার প্রাণ। নিতান্ত বাধ্য হইয়া কাজের চাপে কলিকাতায় যাইতে হয় কিন্তু শান্তিনিকেতনে ফিরিলেই তিনি হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচেন।

বিশ্বভারতী

শান্তিনিকেতনে ছাত্রসংখ্যা বাড়িয়াছে। শুধু বাংলা দেশ নয় অন্যান্য প্রদেশ হইতেও অনেক ছাত্র আসিয়াছে। তাহাদের পড়াইতেও কবি আনন্দ পান, তাহাদের সঙ্গ কবির ভাল লাগে।

ভোর হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্যরাত্রি পর্যন্ত এই বিদ্যালয়ের জন্য তাঁহার পরিশ্রম ও চিন্তার অবধি নাই। সর্বদাই কাজের মধ্যে ডুবিয়া আছেন।

সকাল বিকাল ক্লাস হয়। সকালে কবি একাই তিনটি ক্লাস লন। দুপুরে স্নান আহার সারিয়া চিঠিপত্র লেখেন। তাহার পর ছেলেদের পরের দিন যাহা পড়াইতে হইবে তাহা তৈরি করিয়া রাখেন। সন্ধ্যাবেলা ছাতের উপর বসিয়া বিশ্রাম করেন কিন্তু সব দিন বিশ্রাম হয় না, ছেলেরা দল বাঁধিয়া আসে কবিতা শুনিবার জন্য। কাজেই তাহাদের কবিতা শুনাইতে হয়। কোনো কোনো দিন তাহারা গল্প শুনিতে চায়, সেদিন তাহাদের গল্প বলিতে হয়।

শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের মধ্যে কাজ করিতে করিতেই বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার কথা তাঁহার মনে জাগিল। তিনি একটি আদর্শ বিদ্যালয়ের স্বপ্ন দেখিলেন। এই বিদ্যালয়টি হইবে জাতীয় শিক্ষার কেন্দ্রস্থল। ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের সকল সম্প্রদায়ের ছাত্ররা এখানে আসিয়া মিলিত হইবে। শুধু তাহাই নহে এই প্রতিষ্ঠান হইবে বিশ্বের সহিত ভারতের যোগসূত্র।

সকল সভ্য দেশেই শিক্ষার সঙ্গে দেশের জনসাধারণের যোগ আছে।

> "আমাদের দেশে কেবলমাত্র কেরানিগিরি, ওকালতি, ডাক্তারি, ডেপুটিগিরি, দারোগাগিরি, মুনসেফি প্রভৃতি ভদ্রসমাজে প্রচলিত কয়েকটি ব্যবসায়ের সঙ্গেই আমাদের আধুনিক শিক্ষার প্রত্যক্ষ যোগ। যেখানে চাষ হইতেছে, কলুর ঘানি কুমারের চাক ঘুরিতেছে সেখানে এ শিক্ষার কোনো স্পর্শও পেঁাছায় নাই। অন্য কোনো শিক্ষিত দেশে এমন দুর্যোগ ঘটিতে দেখা যায় না।"

তাহার কারণ দেখাইতে গিয়া কবি বলিয়াছেন যে আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি দেশের মুখ চাহিয়া গড়া হয় নাই। বিদেশীর হাতে বিদেশী ছাঁচে সেগুলি তৈয়ারি হইয়াছে। ভারতবর্ষে সত্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার সহিত তাহাকে মিলাইয়া লইতে হইবে।

> "এই বিদ্যালয় উৎকৃষ্ট আদর্শে চাষ করিবে, গো-পালন করিবে, কাপড় বুনিবে এবং নিজের আর্থিক সম্বললাভের জন্য সমবায় প্রণালী অবলম্বন করিয়া ছাত্র শিক্ষক ও চারিদিকের অধিবাসীদের সঙ্গে জীবিকার যোগে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হইবে।—এইরূপ আদর্শ বিদ্যালয়কে আমি বিশ্বভারতী নাম দিবার প্রস্তাব করিয়াছি।"

সে প্রস্তাবকে তিনি যে কাজে পরিণত করিয়া গিয়াছেন তাহা আমরা জানি। বিশ্বভারতীর দুই শাখা—শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন। শান্তিনিকেতন জ্ঞানকেন্দ্র, শ্রীনিকেতন কর্মকেন্দ্র।

উপাধি বর্জন

ভারতবাসী স্বাধীনতা লাভ করিতে চায় সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজের তাহা ভাল লাগিবে কেন? তাহাদের অত্যাচারের বীভৎসতা দিন দিন বাড়িয়াই চলিল। এই বীভৎসতা মাত্রা ছাড়াইয়া গেল অমৃতসরের জালিনওআলাবাগের হত্যাকাণ্ডে।

প্রতি বৎসর বৈশাখী পূর্ণিমার দিন জালিনওআলাবাগে এক বিরাট মেলা বসে। হাজার হাজার লোকের ভিড় হয় সে মেলায়। সেবারও যথারীতি (১৩ই এপ্রিল ১৯১৯ সাল) মেলা বসিয়াছে। ইংরেজ শাসক জেনারেল ডায়ারের হুকুমে সরকারী সৈন্যদল আসিয়া সেই মেলায় সমাগত অসহায় জনতার উপর গুলি চালাইল। তিন-শ ঊন-আশি জন গুলির আঘাতে প্রাণেই মরিল, আর আহত হইল যে কতজন তাহার হিসাব কে করিবে?

মানুষের প্রতি মানুষের এই নির্মমতায় কবি হৃদয়ে বড় আঘাত পাইলেন। সে সময় তিনি শান্তিনিকেতনে ছিলেন। এই দুঃসংবাদ পাইবামাত্র শান্তিনিকেতন হইতে কলিকাতায় আসিয়া কিভাবে এই অন্যায়ের প্রতিবাদ জানানো যায় তাহার জন্য অনেকের সঙ্গে পরামর্শ করিলেন। কবির ইচ্ছা ছিল জনসভা আহ্বান কবা। কিন্তু সে ব্যবস্থা করা সম্ভব হইল না। তখন তিনি সার্ উপাধি পরিত্যাগ করিয়া বড়লাটের কাছে যে

পত্র লিখেন তাহার কথা বাঙালী কখনো ভুলিবে না। একটি পত্রে কবি এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,

"কলকাতায় এসে বড়োলাটকে চিঠি লিখেছি—আমার ঐ ছার (Sir) পদবীটা ফিরিয়ে নিতে। ... আমি বলেছি, বুকের মধ্যে অনেক ব্যথা জমে উঠেছিল তারই ভার আমার পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠেছে—তাই ঐ ভারের উপরে আমার ঐ উপাধির ভার আর বহন করতে পারছি নে।"

রবীন্দ্রনাথ সেইদিন হইতে ঐ সার্ উপাধি আর কোনো দিন ব্যবহার করেন নাই।

নানা দুর্যোগের মধ্য দিয়া আরও এক বছর কাটিয়া গেল। কবি ইতিমধ্যে একবার আমেদাবাদ ঘুরিয়া আসিলেন। আমেদাবাদের কাছেই সবরমতীতে গান্ধীজির আশ্রম। কবি সে আশ্রমে গিয়াও একরাত্রি বাস করিলেন। সেখান হইতে গেলেন কাঠিয়াবাড় বোম্বাই বরোদা। এইভাবে একমাস ধরিয়া পশ্চিম ভারতে বিশ্বভারতীর আদর্শ প্রচার করিয়া দেশে ফিরিলেন। —এটা বলিতেছি ১৯২০ সালের এপ্রিল মাসের কথা।

মে মাসে আবার বাহির হইলেন ইউবোপ ভ্রমণে। প্রথমে গেলেন ইংলণ্ডে। ইংলণ্ড হইতে ফ্রান্সে হল্যাণ্ডে বেলজিয়মে।

ইউরোপের কয়েকটি দেশ ঘুরিয়া কবি আমেরিকায় পৌঁছিলেন। সেখানে এলমহার্স্ট নামে এক তরুণ বয়সী ইংরাজ ভদ্রলোকের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। বিশ্বভারতীর আদর্শের

কথা শুনিয়া এল্‌ম্‌হার্স্ট কবির প্রতি বিশেষভাবে অনুরক্ত হইলেন। সেই দিন হইতে শ্রীনিকেতনের প্রায় সকল ভারই তিনি নিজের হাতে তুলিয়া লইলেন। আজ শ্রীনিকেতন যে অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে তাহার জন্য আমরা এল্‌ম্‌হার্স্টের কাছে বিশেষ ঋণী।

আমেরিকা হইতে কবি ইংলণ্ডে ফিরিলেন এবং সেখান হইতে আবার গেলেন ফ্রান্সে। ফ্রান্স হইতে সুইজারল্যাণ্ডে, জার্মানিতে, ডেনমার্কে, সুইডেনে, চেকোশ্লোভাকিয়ায়।

১৯২১-এর জুলাই মাসে দেশে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, রাজনীতির উত্তাপে দেশের হাওয়া উত্তপ্ত। গান্ধীজির নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হইয়াছে। যাহা কিছু বিলাতী তাহারই বিরুদ্ধে বিক্ষোভ। বিলাতী কাপড় হইতে আরম্ভ করিয়া বিলাতী বিদ্যা পর্যন্ত—ছাড় ছাড় রব উঠিয়াছে। বন্দেমাতরম্‌ বলিতে বলিতে দেশের ছেলেরা ইস্কুল কলেজ খালি করিয়া পথে বাহির হইয়া আসিল। সে উত্তেজনার স্পর্শ হইতে শান্তিনিকেতনও মুক্ত রহিল না।

কবির দেশপ্রেম কতখানি গভীর কতখানি আন্তরিক তাহা তো কাহারও অজানা নাই। তবু স্বাধীনতালাভের জন্য গান্ধীজি যে পথ দেখাইলেন কবি সে পথকে সত্য পথ বলিয়া মানিয়া লইতে পারিলেন না।

এত উত্তেজনার মধ্যেও তাঁহার রচনা চলিতেছে। এই

সময়কার বিখ্যাত কাব্য শিশুভোলানাথ। বাহিরের উত্তেজনার মধ্য হইতে মন মুক্তি চাহিতেছিল, সেই মুক্তির তাগিদেই এগুলির জন্ম। কবি লিখিয়াছেন,

> "এইজন্য কল্পনায় সেই শিশুলীলার মধ্যে ডুব দিলুম, সেই শিশুলীলার তরঙ্গে সাঁতার কাটলুম, মনটাকে স্নিগ্ধ করবার জন্যে নির্মল করবার জন্যে মুক্ত করবার জন্যে।"

ছোট ছেলে হওয়ার সাহস
আছে কি এক ফোঁটা
তাই তো এমন বুড়ো হয়েই মরি।
তিলে তিলে জমাই কেবল,
জমাই এটা ওটা,
পলে পলে বাক্স বোঝাই করি।
কালকে দিনের ভাবনা এসে
আজ দিনেরে মারলে ঠেসে
কাল তুলি ফের পরদিনের বোঝা।
সাধের জিনিস ঘরে এনেই
দেখি এনে ফল কিছু নেই
খোঁজার পরে আবার চলে খোঁজা।

চীন-জাপান

বিশ্বভারতীর সকল কাজ কবি একলাই চালাইয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু কর্মক্ষেত্র প্রতিদিন প্রসারিত হইতেছিল, ছাত্র ও অধ্যাপকের সংখ্যাও ক্রমে ক্রমে বাড়িতেছিল। তাঁহার একলার পক্ষে এই গুরুদায় বহন করা সম্ভব হইতেছিল না। তাই তিনি 'বিশ্বভারতী' প্রতিষ্ঠানকে সর্বসাধারণের হাতে তুলিয়া দিবার সংকল্প করিলেন। ১৯২১-এর ২৩শে ডিসেম্বর আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের সভাপতিত্বে এই উপলক্ষে একটি সভা হইল। ঐ সভায় আনুষ্ঠানিকভাবে কবির সঙ্কল্প কার্যে পরিণত করা হইল। স্থির হইল—কবির বাংলা বই হইতে যাহা কিছু আয় হইবে সবই বিশ্বভারতী পাইবে। কবি যে নোবেল পুরস্কার পাইয়াছিলেন সেই টাকার সুদও বিশ্বভারতীর কাজেই খরচ হইবে।

এখন হইতেই দেশ-বিদেশের বড় বড় পণ্ডিতের সমাগম হইতে লাগিল। ফ্রান্স হইতে আসিলেন সিলভান লেভি, আমেরিকা হইতে এলম্‌হার্স্ট। পরের বৎসর বিদেশী বিশেষজ্ঞ ও জ্ঞানীগুণী অধ্যাপকের সংখ্যা আরও অনেক বাড়িয়া গেল।

বিশ্বভারতী যতই কবির আদর্শ অনুসারে বড় হইতে লাগিল খরচের পরিমাণও ততই বাড়িতে লাগিল। বইয়ের আয়ে

ও নোবেল পুরস্কারের সুদে সে ব্যয় সঙ্কুলান করা অসম্ভব: তাই কবিকে মাঝে মাঝে টাকার সন্ধানে দেশ ভ্রমণে বাহির হইতে হয়। মাঝে মাঝে কলিকাতার রঙ্গমঞ্চে গীতোৎসবের অনুষ্ঠানও হয়। বর্ষামঙ্গল উৎসব আরম্ভ হয় এই সময়।

ইহারই মধ্যে বিখ্যাত নাটক 'যক্ষপুরী' লেখা হইল। এই নাটকেরই নূতন রূপ 'রক্তকরবী'। গান ও কবিতাও কিছু কিছু লেখা চলিতেছে। রাজনৈতিক আন্দোলন সম্বন্ধেও বিবিধ রচনায় কবি আপন মত প্রকাশ করিতেছিলেন।

১৯২৪-এ চীনদেশ হইতে নিমন্ত্রণ আসিল। মার্চ মাসে কবি যাত্রা করিলেন। সঙ্গী হইলেন ক্ষিতিমোহন সেন, নন্দলাল বসু, কালিদাস নাগ আর এলম্‌হার্স্ট সাহেব। চীনে বিভিন্ন সভায় কবি এশিয়ার ঐক্যের বাণী প্রচার করিয়া জাপানে চলিয়া গেলেন। সেখানেও কয়েকটি বক্তৃতা হইল।

চীন জাপান ঘুরিয়া ভারতে ফিরিতে না ফিরিতেই দক্ষিণ আমেরিকা হইতে ডাক পড়িল। কবির শরীর তখন ভাল ছিল না—সেই অসুস্থ শরীর লইয়াই তিনি আবার বাহির হইয়া পড়িলেন। এলম্‌হার্স্ট সঙ্গে গেলেন সেক্রেটারী হইয়া।

পাঁচমাস পথে ও প্রবাসে কাটাইয়া কবি ১৯২৫-এ দেশে ফিরিলেন। ভ্রমণপথে কবি অনেকগুলি কবিতা লিখেন। 'পূরবী' কাব্যে সেগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ সময়ে যে ডায়রি লিখিয়াছিলেন সেগুলি বাহির হয় 'যাত্রী' গ্রন্থে।

বাংলাদেশে তখন সরকারী অত্যাচার প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। যে সব ছেলেরা দেশের কাজে নামিয়াছে গবর্ণমেণ্ট তাহাদের আটক করিয়া রাখিতেছেন। সে সব দুঃসংবাদ কবির কাছে গিয়া পৌঁছিতেছে। শুনিয়া কবি চঞ্চল হইয়া উঠিতেছেন। নাতি দিনেন্দ্রনাথকে লিখিত একটি চিঠিতে তাঁহার তখনকার মনো-ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়ঃ

প্রতাপ যখন চেঁচিয়ে করে দুঃখ দেবার বড়াই,
জেনো মনে, তখন তাহার বিধির সঙ্গে লড়াই।
দুঃখ সহার তপস্যাতেই হোক বাঙালীর জয়,
ভয়কে যারা মানে তারাই জাগিয়ে রাখে ভয়।

মৃত্যুকে যে এড়িয়ে চলে মৃত্যু তারেই টানে,
মৃত্যু যারা বুক পেতে লয় বাঁচতে তারাই জানে।
পালোয়ানের চেলারা সব ওঠে যেদিন খেপে
ফোঁসে সর্প হিংসা-দর্প সকল পৃথ্বী ব্যেপে

বীভৎস তার ক্ষুধার জ্বালায় জাগে দানব ভায়া
গর্জি বলে আমিই সত্য; দেবতা মিথ্যা মায়া:
সেদিন যেন কৃপা আমায় করেন ভগবান.
মেশিনগানের সম্মুখে গাই যুঁই ফুলের এই গান।

১৯২৫-এর ফেব্রুয়ারি মাসে কবি দেশে ফিরিয়া আসিলেন। গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলন তখনও শান্ত হয় নাই। দেশের লোক গান্ধীজির আহ্বানে স্বরাজ লাভের আশায় চরকা

কাটিতে ব্যস্ত। শান্তিনিকেতনের অধ্যাপকরাও চরকায় সুতা কাটিতেছেন। কবি কখনো নিজের মত অন্যের উপর চাপান নাই। চরকার দ্বারাই স্বাধীনতা লাভ হইবে ইহা তিনি বিশ্বাস করিতেন না। কিন্তু যাঁহারা বিশ্বাস করিতেন তাঁহাদের কাজে কখনো বাধা দেন নাই।

এই সময় গান্ধীজি একবার কয়েকদিনের জন্য শান্তিনিকেতনে আসিয়া রবীন্দ্রনাথের সহিত দেখা করিয়াছিলেন। দুইজনের মধ্যে তখনকার রাজনীতি সম্পর্কে অনেক আলোচনা হয়। কিন্তু গান্ধীজি কবিকে স্বমতে আনিতে পারেন নাই।

ইতিপূর্বে কবি 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' নামে একটি উপন্যাস লিখিয়াছিলেন। এখন ইহাকে নাটক আকারে পরিবর্তিত করেন. নাম দেন 'চিরকুমার সভা'। আরও দুইটি নাটক এই সময় লিখিত হয়, 'শোধবোধ' এবং 'গৃহপ্রবেশ'। তিনটি নাটকই কলিকাতার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়।

রবীন্দ্রনাথকে কবি বলিয়াই সাধারণ লোকে জানে। কিন্তু পণ্ডিতেরা জানেন তিনি কেবল কবি নহেন, তিনি একজন শ্রেষ্ঠ দার্শনিক। ১৯২৫-এর ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় দার্শনিক পণ্ডিতদের এক সম্মেলন হয়। কবি সেই দর্শন-সম্মেলনের সভাপতি হন।

দর্শন সম্মেলন সারিয়াই গেলেন লখনৌ-এ নিখিল ভারত সংগীত সম্মেলনের আহ্বানে। এমন সময় বড়দাদা দ্বিজেন্দ্র-

নাথের মৃত্যু হইল। কবি সে সংবাদ পাইয়াই তাড়াতাড়ি ফিরিয়া আসিলেন।

এই সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কবির নিমন্ত্রণ আসিল। ঢাকা হইতে ফিরিবার পথে কবি পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ঘুরিয়া আগড়তলায় আসিলেন। কবি যেখানেই গিয়াছেন সেখানেই বিপুল সংবর্ধনা পাইয়াছেন।

আগড়তলায় কবি মণিপুরী নৃত্য দেখিয়া অত্যন্ত খুশী হইলেন। শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ে এই নৃত্যকলা শিখাইবার জন্য তিনি সেখান হইতে একজন নৃত্য-শিক্ষককে সঙ্গে লইয়া আসিলেন। আজ বাংলাদেশের নৃত্য-রসিক জন-সাধারণের কাছে মণিপুরী নৃত্য সুপরিচিত। কবিগুরুই যে ইহার প্রথম প্রবর্তক সে-কথা অনেকেরই জানা নাই।

পূর্ববঙ্গের ভ্রমণ সারিয়া কলিকাতায় ফিরিলেন ১৯২৬-এর মার্চ মাসে। সেখান হইতে আসিলেন শান্তি-নিকেতনে। 'নটীর পূজা' নাটিকাটি এই সময়ে লেখা হয়। 'কথা ও কাহিনী'র বিখ্যাত কবিতা 'পূজারিনী'। 'নটীর পূজা' ইহারই নাট্যরূপ। ১৩৩৩-এর জন্মদিনে (১৯২৬) শান্তি-নিকেতন আশ্রমে এই নাটিকার প্রথম অভিনয় হয়। পরে কলিকাতার রঙ্গমঞ্চেও ইহা অভিনীত হইয়াছিল।

পূর্বদ্বীপ

. কবির বয়স ৬৫ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে কিন্তু মনের তারুণ্য কিছুমাত্র কমে নাই। "আমি চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়াসী।"—তাঁহার সারাজীবন ধরিয়া সেই সুদূরের পিপাসা দেখিতেছি। সে পিপাসা শুধু মানসলোকেরই নয়, বস্তু-লোকেরও। তিনি এক ঠাঁই চুপ করিয়া দীর্ঘদিন বসিয়া থাকিতে পারেন না।

এবার ডাক আসিয়াছে ইটালি হইতে। ১৯২৬-এর মে মাসে বোম্বাই হইতে জাহাজ ছাড়িল। রোমে পেঁছিলেন ৩০শে মে। রোমে সবসুদ্ধ চোদ্দ দিন ছিলেন। এই কয়দিনে অনেক সভা-সমিতির অনুষ্ঠান হয়। সারাদেশ কবির সংবর্ধনায় মাতিয়া উঠে। মুসোলিনির সহিত কবির সাক্ষাৎ হইল। মুসোলিনি কবিকে বলিলেন, ইটালীয় ভাষায় রবীন্দ্রনাথের যতগুলি বই অনূদিত হইয়াছে—তাহার প্রত্যেকটিই তিনি পড়িয়াছেন।

রোম বিশ্ববিদ্যালয় হইতেও কবিকে অভিনন্দন দেওয়া হইল। একদিন এক বৃহৎ সভায় পঁচিশ-ত্রিশ হাজার লোক সমবেত হইয়া কবিকে সংবর্ধনা করে।

রোমে দুই সপ্তাহ কাটাইয়া কবি বাহির হইয়া পড়িলেন ইউরোপ পরিক্রমায়। জুরিখ ভিয়েনা প্যারিস লণ্ডন

ভিভনশায়ার ঘুরিয়া আসিলেন সুইডেনে, তারপর ডেনমার্কে। তাহার পর গেলেন মধ্য ইউরোপে। মধ্য ইউরোপের নানা স্থানে ঘুরিয়া আবার দেশের দিকে ফিরিলেন। ফিরতি পথে মিশরের বন্দর আলেকজান্দ্রিয়াতে নামিয়া কায়রোয় গেলেন।

কায়রো মিশরেব রাজধানী। কবি এখানে আসিয়া পেঁাছিলে এক জনসভায় তাঁহাকে সংবর্ধনা করা হয়। মিশরের রাজা ফুয়াদও কবিকে অভিনন্দিত করেন।

সাত আট মাস বিদেশে ঘুরিয়া ডিসেম্বর মাসে কবি দেশে ফিরিলেন—পৌষ উৎসবের কয়েকদিন আগে। দেশের আব-হাওয়া অশান্ত। হিন্দু-মুসলমানে বিরোধ লাগিয়াছে। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ দিল্লীতে এক মুসলমান যুবকের হাতে নিহত হইয়াছেন। সর্বত্রই তাহার উত্তেজনা অনুভূত হইতেছে।

একে তো সাম্প্রদায়িক বিরোধ, তাহার উপর সরকারী অবিচার অত্যাচার সমানে চলিতেছে। রাজনৈতিক কারণে যুবকদের আটক করা হইয়াছে, লেখকেরা স্বাধীন মত ব্যক্ত করিতে পারিতেছেন না। অনেক গ্রন্থ রাজনৈতিক কারণে বাজেয়াপ্ত হইতেছে।

এই সব কারণে রবীন্দ্রনাথের মন স্বভাবতঃই চঞ্চল। এই চাঞ্চল্য চাপা পড়িল অভিনয়ের উদ্‌যোগে। মাঘোৎসব উপলক্ষে ‘নটীর পূজা’ অভিনীত হইল। ইহার আগের বৎসর ‘নটীর পূজা’র প্রথম অভিনয় হয় কলিকাতায়। সেবার এ

গীতিনাট্যে পুরুষের ভূমিকা ছিল না। এবার একটি নূতন ভূমিকা যুক্ত হইল—উপালির। কবি নিজে সেই ভূমিকা গ্রহণ করিলেন।

ইহার পর আরম্ভ হইল ঋতু-বন্দনা। 'নটরাজ' এই সময়-কার রচনা।

এই সময় কবি একবার ভরতপুর জয়পুর ও আমেদাবাদ ঘুরিয়া আসিলেন। গরমের সময় বিদ্যালয়ের ছুটি হইল। কবি নিজেও একটু বিশ্রামের প্রয়োজন অনুভব করিতেছেন। তাই শিলং-এ চলিয়া গেলেন। 'যোগাযোগ' নামক বিখ্যাত উপন্যাসটি এখানে বসিয়াই লিখিতে আরম্ভ করেন।

১৯২৭ সাল। কবি আবার বাহির হইয়া পড়িলেন। বয়স ছেষট্টি পার হইয়াছে। শরীরও ক্লান্ত। কিন্তু বাধাকে তিনি কখনো গ্রাহ্য করেন নাই।

এবার চলিলেন বৃহত্তর ভারতে। মালয় দ্বীপ যবদ্বীপ বালিদ্বীপ ও শ্যামদেশ ভ্রমণ করা হইল। এইভাবে প্রায় সাড়ে তিনমাস বাহিরে কাটাইয়া কবি দেশে ফিরিয়া আসিলেন। ফিরিবার সময় জাহাজে বসিয়া অনেকগুলি কবিতা লিখিয়া-ছিলেন। 'পরিশেষ' কাব্যে সেগুলি সংগৃহীত আছে।

বঙ্গোপসাগরে ইরাবতী নদীর মোহানায় যখন জাহাজ আসিয়া পেঁছে তখন যে কবিতাটি লিখিয়াছিলেন তাহার কয়েক ছত্র তুলিয়া দিতেছি। কবিতার নাম মোহানা।

ইরাবতীর মোহানামুখে কেন আপনভোলা
সাগর তব বরণ কেন ঘোলা।
কোথা সে তব বিমল নীল স্বচ্ছ চোখে চাওয়া
রবির পানে গভীর গান গাওয়া?
নদীর জলে ধরণী তার পাঠালে এ কী চিঠি,
কিসের ঘোরে আবিল হল দিঠি।
আকাশ সাথে মিলায়ে রং আছিলে তুমি সাজি
ধরার রঙে বিলাস কেন আজি।
রাতের তারা আলোকে আজ পরশ করে যবে .
পায়না সাড়া তোমার অনুভবে;
প্রভাত চাহে স্তব্ধ জলে নিজেরে দেখিবারে
বিফল করি ফিরায়ে দাও তারে।

পূর্বদ্বীপ ভ্রমণ সারিয়া আসিয়া আবাব শান্তিনিকেতনের কাজে লাগিলেন। 'যোগাযোগ' উপন্যাস তখনও সমাপ্ত হয় নাই, তাহাব শেষেব অংশ লিখিতেছেন। নূতন উপন্যাসও একটি আরম্ভ হইল—তাহাব নাম 'শেষেব কবিতা।'

বৃক্ষরোপণ উৎসব

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে হিবার্ট বক্তৃতা দিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। রবার্ট হিবার্ট নামক এক বণিক ধর্মবিষয়ক বক্তৃতাদির জন্য কিছু অর্থ দিয়া যান। তাহার দ্বারাই এই বক্তৃতামালার ব্যবস্থা হয়। কবি নিমন্ত্রণরক্ষার জন্য বাহির হইলেন বটে কিন্তু পথেই অসুস্থ হইয়া পড়াতে সে যাত্রা আর যাওয়া হইল না। কলম্বো মহীশূর ঘুরিয়া শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া আসিলেন।

'যোগাযোগ' সম্পূর্ণ হইয়াছে, 'শেষের কবিতা'ও শেষ হইয়াছে। ইহারই মধ্যে অনেকগুলি কবিতাও লিখিয়া ফেলিয়াছেন। সেই কবিতাগুলি সংগৃহীত হইয়াছে 'মহুয়া' কাব্যে। 'শেষের কবিতা' উপন্যাসের জন্য অনেকগুলি কবিতা রচিত হইয়াছিল, সে গুলিও মহুয়ার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

এখন বর্ষাকালে সারা দেশ জুড়িয়া বন-মহোৎসব অনুষ্ঠান দেখিতে পাই। সরকারী উদ্‌যোগেও এই উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। কিন্তু এ উৎসবের প্রবর্তন করেন রবীন্দ্রনাথ আজ হইতে তেত্রিশ বৎসর পূর্বে ৩০শে আষাঢ় ১৩৩৫ (ইং ১৯২৮) সালে।

আর একটি উৎসবের প্রবর্তন হয় এই সময়—সেটি হইল হলচালন। হলচালনা করা ভদ্রলোকের কাজ নয়—ভারতবর্ষে

এইরূপ একটি সংস্কার আছে। কবি এই উৎসবে নিজের হাতে লাঙ্গল ধরিয়া সেই সংস্কার দূর করিবার চেষ্টা করেন।-

তাঁহার একটি চিঠিতে এই দুই উৎসবের সুন্দর বর্ণনা আছে। চিঠিটি লিখিয়াছিলেন পুত্রবধূ প্রতিমা দেবীকে। ঐ পত্রের খানিকটা তুলিয়া দিতেছি ঃ

> "এখানে হল বৃক্ষরোপণ, শ্রীনিকেতনে হল হলচালন। তোমার টবের বকুল গাছটাকে নিয়ে বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠান হল।.. সুন্দরী বালিকারা সুপরিচ্ছন্ন হয়ে শাঁখ বাজাতে বাজাতে গান গাইতে গাইতে গাছের সঙ্গে সঙ্গে যজ্ঞক্ষেত্রে এল—শাস্ত্রীমশায় (বিধুশেখর শাস্ত্রী) সংস্কৃত শ্লোক আওড়ালেন—আমি একে একে ছটা কবিতা পড়লুম—মালা দিয়ে চন্দন দিয়ে ধূপ ধুনো জ্বালিয়ে তার অভ্যর্থনা হল। তার পরে বর্ষামঙ্গল গান হল।"

বিদ্যালয়ের কাজ চলিতেছে। অর্থের অভাবে তাহাকে মনের মত করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারিতেছেন না। এ দুশ্চিন্তা সত্ত্বেও কবিতার বিরাম নাই। বিস্ময়ের কথা এই যে এই সময়েই অনেকগুলি প্রেমের কবিতা রচিত হইয়াছিল 'মহুয়া' কাব্যে সেগুলি স্থান পাইয়াছে।

অনেক দিন বাহিরে যান নাই। বাঁধাধরা কাজের গণ্ডির মধ্যে আটক থাকিয়া মনটা ছটফট করিতেছে। এমন সময়

আবার ভ্রমণের সুযোগ আসিল। কানাডায় এক প্রতিষ্ঠান শিক্ষাবিষয়ে ভাষণ দিবার জন্য কবিকে আমন্ত্রণ করিলেন।

কানাডায় দশদিন কাটাইয়া ফিরিবার পথে কবি জাপানে আসিয়া একমাস অবস্থান করিলেন।

বড় লোকের অটোগ্রাফ অর্থাৎ স্বাক্ষর লইবার নেশা আমাদের দেশের ছেলেমেয়েদের মধ্যে যে দেখিতে পাই সেটা বোধ হয় খুব পুরাতন নয়। রবীন্দ্রনাথ এইবার গিয়া জাপানে যে এক মাস কাটাইলেন এই সময়ে সেখানকার লোক পাখায় কাগজে রুমালে তাঁহার হাতের লেখা চাওয়ায় অনেকগুলি টুকরা কবিতার জন্ম হইল। ইহার পূর্বে চীনেও এ জাতীয় অনুরোধে কিছু কিছু কবিতা লেখা হইয়াছিল।

বাংলা ভাষা তাহাদের বুঝিবার কথা নয়, তবু কবি বাংলা কবিতাই লিখিয়াছিলেন। কবি বলেন,

> "সেখানে তারা আমার বাংলা লেখাই চেয়েছিল, কারণ বংলাতে একদিকে আমার, আবার একদিকে সমস্ত বাঙালী জাতিরই স্বাক্ষর।"

এই কবিতাগুলি সংকলন করিয়া 'লেখন' গ্রন্থে কবির হস্তাক্ষরে মুদ্রিত করা হইয়াছে। 'লেখন'-এর সব কবিতাই চীন জাপানে লেখা নয়। চীন জাপানে যাইবার পূর্বে ও পরেও অনেকগুলি কবিতাকণা লেখা হইয়াছিল। সেগুলিও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। 'লেখন'-এর একটি কবিতা উদ্ধৃত করিতেছিঃ

স্বপ্ন আমার জোনাকি
দীপ্ত প্রাণের মণিকা,
স্তব্ধ আঁধার নিশীথে
উড়িছে আলোক কণিকা॥

শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া আসিয়া এবার কবি ছবি আঁকায় মাতিলেন। 'লেখায় অনেক সৃষ্টি হইয়াছে' এবার চলিল রেখার খেলা। 'রাজা ও রানী' নাটকটিকেও এই সময় নূতন করিয়া লিখিলেন। 'রাজা ও রানী ছিল পদ্যে নূতন নাটক 'তপতী' লেখা হইল গদ্যে।

জোড়াসাঁকোয় এই নাটকের অভিনয় হইল। কবি নিজেও ইহাতে অংশ গ্রহণ করিলেন। অভিনয় করিলেন রাজা বিক্রমের ভূমিকায়।

রাশিয়া

বছর দুয়েক আগে অক্সফোর্ডে হিবার্ট লেকচার দিবার জন্য নিমন্ত্রণ আসিয়াছিল। সেবার যাত্রা করিয়াও অসুস্থতার জন্য তাঁহাকে ফিরিয়া আসিতে হয়। এবার সেখান হইতে আবার আহ্বান আসিল। কবি দল বল লইয়া আবার যাত্রা করিলেন।

ইংলণ্ডে না গিয়া প্রথম গেলেন ফ্রান্সে। কবি কিছুকাল ধরিয়া যে সব ছবি আঁকিয়াছিলেন, সেই ছবিগুলি সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। ফরাসী দেশ শিল্পীর দেশ। ইচ্ছা ছিল সেখানে ছবির একটি প্রদর্শনী করেন।

মাসখানেকের চেষ্টায় কবির ইচ্ছা পূর্ণ হইল। প্যারিসে রবীন্দ্রনাথের আঁকা চিত্রগুলির একটি প্রদর্শনী হইল। সমজদার শিল্পী ও শিল্পসমালোচকরা কবির চিত্রকলার বিশেষ সমাদর করিলেন।

প্যারিস হইতে কবি ইংলণ্ডে আসিলেন। অক্সফোর্ডে হিবার্ট বক্তৃতামালার প্রথম বক্তৃতা হয় ১৯৩০-এর ১৯শে মে তারিখে। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বক্তৃতাও এক সপ্তাহের মধ্যেই দেওয়া হয়। বক্তৃতার বিষয় মানব-ধর্ম।

ইংলণ্ড হইতে কবি গেলেন জার্মানিতে। জার্মানির রাজধানী বার্লিন। এখানে বিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের সহিত তাঁহার প্রথম দেখা হয়। এখান হইতে গেলেন জেনেভায়। সেখানে মাসখানেক কাটাইয়া যাত্রা করিলেন রাশিয়া দর্শনে।

১১ই হইতে ২৫শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মস্কোতে থাকিয়া সেখানকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান দেখিলেন।

রাশিয়া দেখিয়া তাঁহার মনের মধ্যে একটা আলোড়নের সৃষ্টি হইয়াছিল। ঐ সময়কার কোনো কোনো পত্রে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। একটি চিঠিতে প্রতিমা দেবীকে লিখিতেছেন,

> " .নিজেদের ভরণ পোষণের দায়িত্ব আমাদের গরিব চাষি প্রজাদের 'পরে যেন আর চাপাতে না হয়। এ কথা আমার অনেক দিনের পুরোনো কথা। বহুকাল থেকেই আশা করেছিলুম, আমাদের জমিদারি যেন আমাদের প্রজাদেরই জমিদারি হয়—আমরা যেন ট্রাস্টির মতো থাকি। অল্প কিছু খোরাক পোশাক দাবি করতে পারব কিন্তু সে ওদেরই অংশিদারের মত। কিন্তু দিনে দিনে দেখলুম জমিদারির রথ সে রাস্তায় গেল না। আর-একবার আমার বহুদিনের আশা পূর্ণ করবার আশা করব।"

রাশিয়া সম্বন্ধে কবি যে সব পত্র লিখিযাছিলেন সেগুলি একত্র কবিয়া 'রাশিয়ার চিঠি' নামক একটি গ্রন্থ বাহির হইয়াছে।

রাশিয়া হইতে কবি গেলেন আমেরিকায়। সেখানে মাস তিনেক কাটাইয়া লণ্ডনে আসিলেন। সেখানে কয়েকদিন থাকিয়া দেশে ফিরিয়া আসিলেন ১৯৩১-এব ফেব্রুয়ারি মাসে।

শান্তিনিকেতনে ফিরিয়াই গীতোৎসবের উদযোগ আরম্ভ

হইল। কবি এই সময় অনেকগুলি গান লিখিলেন। এই গান-গুলি সাজাইয়া 'নবীন' নামক গীতিনাট্য রচিত হইল। ইহার অভিনয় হইল শান্তিনিকেতনেই দোলপূর্ণিমার দিন। কয়েক-দিন পরে কলিকাতার রঙ্গমঞ্চেও 'নবীন'এর অভিনয় হইল।

এবারকার জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইল শান্তিনিকেতনে। কবির সত্তর বৎসর পূর্ণ হইল।

ইহার কয়েকমাস পরে কলিকাতায় সত্তর বৎসরের জয়ন্তী খুব সমারোহের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু তাহার পূর্বেই হিজলি জেলে এমন এক কান্ড ঘটে যাহার আঘাতে সারা দেশ চঞ্চল হইয়া উঠে। রাজনৈতিক বন্দী হিসাবে কয়েকশত বাঙালী যুবক ঐ জেলে আটক ছিলেন। ইঁহাদের কয়েক-জনের সঙ্গে প্রহরীদের বিরোধ বাধে। প্রহরীরা তখন গুলি করিয়া দুইজনকে হত্যা করে। নির্মম প্রহারের ফলে কয়েকজন বন্দী সাংঘাতিক ভাবে আহত হন।

এই অত্যাচারের প্রতিবাদে কলিকাতায় মনুমেন্টের তলায় এক বিরাট সভা হয়। রবীন্দ্রনাথ সেই সভায় সভাপতিরূপে যে ভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন তাহার কয়েক ছত্র এখানে তুলিয়া দিতেছি ঃ

" ... এই যে হিজলির গুলি চালনা ব্যাপারটি আমাদের আলোচ্য বিষয় তার শোচনীয় কাপুরুষতা ও পশুত্ব যা ... আমার বলবার, সে কেবল অবমানিত মনুষ্যত্বের

দিকে তাকিয়ে। ... এ সভায় আমার আগমনের কারণ আর কিছুই নয়. আমি আমার স্বদেশবাসীর হয়ে রাজপুরুষদের এই বলে সতর্ক করতে চাই যে. বিদেশী রাজা যত পরাক্রমশালী হোক না কেন, আত্মসম্মান হারানো তার পক্ষে সকলের চেয়ে দুর্বলতার কারণ। ... প্রজাকে পীড়ন স্বীকার করে নিতে বাধ্য করা রাজার পক্ষে কঠিন না হতে পারে। কিন্তু বিধিদত্ত অধিকার নিয়ে প্রজার মন যখন স্বয়ং রাজাকে বিচার করে তখন তাকে নিরস্ত করতে পারে কোন্ শক্তি? এ কথা ভুললে চলবে না যে প্রজাদের অনুকূল বিচার ও আন্তরিক সমর্থনের 'পরেই অবশেষে বিদেশী শাসনের স্থায়িত্ব নির্ভর করে।"

কলিকাতায় বাদ-প্রতিবাদ চলিতে থাকিল। কবি শান্তিনিকেতনে চলিয়া আসিলেন। ২রা অক্টোবর আশ্রমে গান্ধীজির জন্মতিথি অনুষ্ঠিত হইল। কবি সেই অনুষ্ঠানে বলিলেন. গান্ধীজি বড় রাষ্ট্রনায়ক। কিন্তু কেবল সেই জন্যই যে তাঁহাকে আমরা মান্য করি তাহা নয়। তাঁহার সর্বাপেক্ষা বড় কাজ, তিনি আমাদের ভয় ভাঙাইয়াছেন।

"যে দৃঢ় শক্তির বলে তিনি আজ সমগ্র ভারতবর্ষকে প্রবলভাবে সচেতন করেছেন, সেই শক্তির মহিমাকে আমরা উপলব্ধি করব।"

পূজার ছুটি আসিয়া পড়িল। বিদ্যালয় বন্ধ হইলে কবি

দার্জিলিং চলিয়া গেলেন। মাসখানেক সেখানে থাকিয়া আবার শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া আসিলেন। ছবির নেশা তখনও কাটে নাই। কবিতা লেখার সঙ্গে সঙ্গে ছবি আঁকা চলিতেছে। শিল্পী নন্দলাল বসুর পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হইলে এই সময় এক কবিতায় তাঁহার উদ্দেশে লিখিলেন :

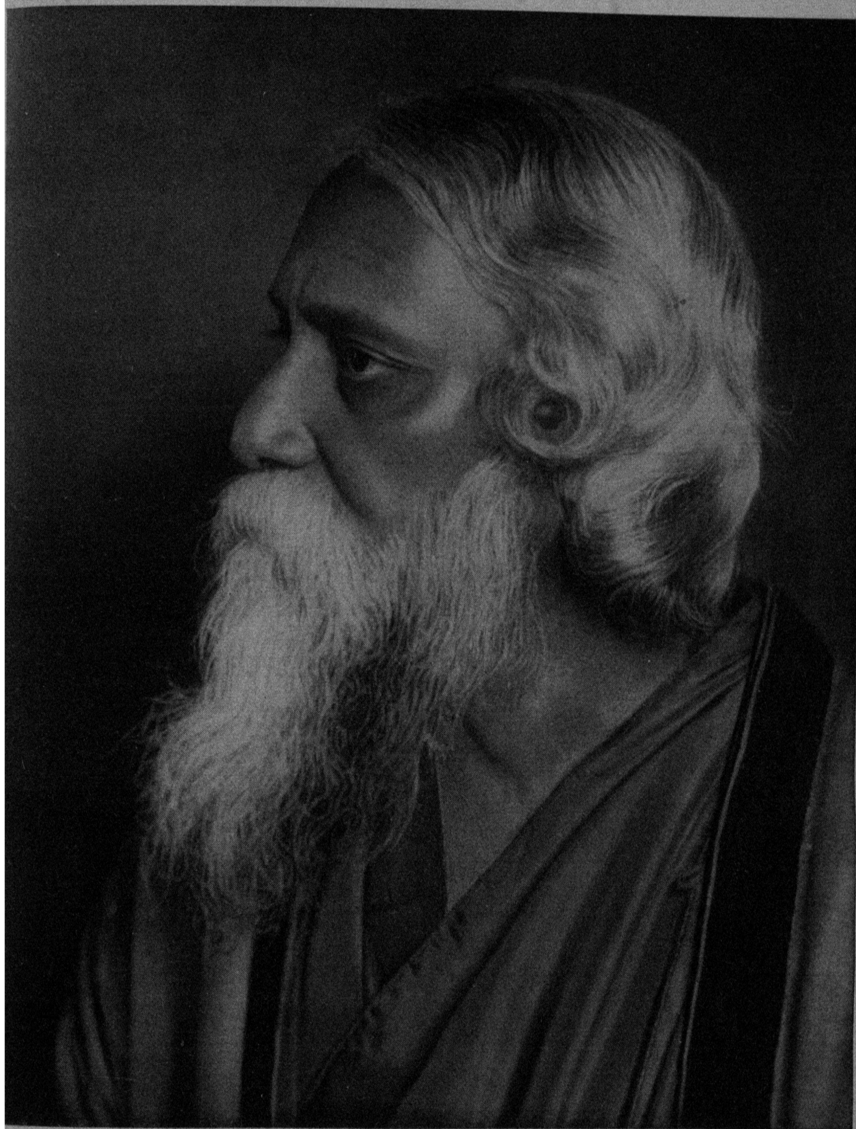
তোমারি খেলা খেলিতে আজি উঠেছে কবি মেতে
নববালক জন্ম নেবে নূতন আলোকেতে।

জয়ন্তী উৎসব

বড়দিনের ছুটিতে কলিকাতায় কবির সত্তর বৎসর পূর্তি উপলক্ষে জয়ন্তী উৎসবের বিপুল আয়োজন। কবি শান্তিনিকেতন হইতে কলিকাতায় আসিয়াছেন। টাউন হলে তাঁহার চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হইয়াছে। সাহিত্য-সম্মেলন, গীতানুষ্ঠান, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অভিনন্দন প্রদান, ইংরাজী ও বাংলায় স্মারক গ্রন্থ রচনা—এই সব ছিল জয়ন্তী উৎসবের প্রধান অঙ্গ।

রবীন্দ্রজয়ন্তী উৎসব পরিষদের পক্ষ হইতে যে অভিনন্দন পাঠ করা হয় সেটি রচনা করিয়াছিলেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। কবি অভিনন্দনের উত্তরে বলিয়াছিলেন,

> "আবাল্যকাল দেশমাতার প্রাঙ্গণে গাহিয়াই আমার কণ্ঠসাধনা। মাঝে মাঝে যখন মনে হইত উদাসীন তিনি, তখন বুঝি-বা তাঁহার অগোচরেও সুর পৌঁছিয়াছিল তাঁহার অন্তরে। যখন মনে হইয়াছে তিনি মুখ ফিরাইয়াছেন তখনও হয়তো তাঁহার শ্রবণদ্বার রুদ্ধ হয় নাই। ভাল ও মন্দ, পরিণত ও অপরিণত, আমার নানা প্রয়াস তিনি দিনে দিনে মনে মনে আপন স্মৃতিসূত্রে গাঁথিয়া লইতেছিলেন। অবশেষে সত্তর বৎসর বয়সে. যখন তাঁহার সেই মালায় শেষ গ্রন্থি দিবার সময় আসন্ন,



তখনই আমার দীর্ঘ জীবনের চেষ্টা তাঁহার দৃষ্টিসম্মুখে সমগ্রভাবে সম্পূর্ণপ্রায়। সেইজন্যই তাঁহার এই সভায় আজ সকলের আমন্ত্রণ, স্নিগ্ধস্বরে তাঁহার এই বাণী আজ উচ্চারিত—'আমি গ্রহণ করিলাম।'...তাঁহার সেই অঙ্গীকারই এই উৎসবের মধ্য দিয়া আমাকে বর দান করিল। আমার জীবনের এই শেষ বর, এই শ্রেষ্ঠ বর।"

ছাত্র-ছাত্রী উৎসব-পরিষদের পক্ষ হইতে যে অভিনন্দন দেওয়া হয় তাহার উত্তরে কবি যে ভাষণ পাঠ করেন কবির কাব্য-সাধনার মূল কথাটি তাহার মধ্যে বলা হইয়াছে। ঐ ভাষণের উপসংহারে বলেন,

"মর্ত্যলোকের শ্রেষ্ঠদান এই প্রীতি আমি পেয়েছি এ কথা প্রণামের সঙ্গে বলি। পেয়েছি পৃথিবীর অনেক বরণীয়দের হাত থেকে—তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞতা নয় আমার হৃদয় নিবেদন করে দিয়ে গেলেম।

জীবনের পথ দিনের প্রান্তে এসে
নিশীথের পানে গহনে হয়েছে হারা।
অঙ্গুলি তুলি তারাগুলি অনিমেষে
মাভৈঃ বলিয়া নীরবে দিতেছে সাড়া।
ম্লান দিবসের শেষের কুসুম তুলে
এ কূল হইতে নবজীবনের কূলে
চলেছি আমার যাত্রা করিতে সারা।

যা কিছু পেয়েছি যাহা কিছু গেল চুকে,
চলিতে চলিতে পিছিয়া রহিল পড়ে,
যে মণি দুলিল যে ব্যথা বিঁধিল বুকে,
ছায়া হয়ে যাহা মিলায় দিগন্তরে,
জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা
ধূলায় তাদের যত হোক অবহেলা,
পূর্ণের পদ-পরশ তাদের 'পরে।"

এই উৎসব উপলক্ষে 'শাপমোচন' নাটিকার অভিনয় হয় কবির জোড়াসাঁকো বাসভবনে। নাটিকাটি পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশ করেন রবীন্দ্র-জয়ন্তী ছাত্রছাত্রী-উৎসব-পরিষদ। যে বৌদ্ধ কাহিনী অবলম্বন করিয়া 'রাজা' নাটক রচিত হইয়াছিল এই নাটিকাটি রচিত হয় তাহারই আভাসে।

এক সপ্তাহ ধরিয়া জয়ন্তী-উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছিল। কিন্তু ৪ঠা জানুয়ারি (১৯৩২) সংবাদ আসিল গান্ধীজিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। উৎসব সমাপ্ত হইবার আগেই বন্ধ হইয়া গেল।

সরকারী অনাচার অবিচারে কবির মন অনেক দিন আগে হইতেই অশান্ত ছিল। গান্ধীজির গ্রেপ্তারে সে অশান্তি আরও বৃদ্ধি পাইল। সংবাদপত্রে এক বাণী পাঠাইয়া তিনি এই অন্যায়ের প্রতিবাদ জানাইলেন।

'প্রশ্ন' নামক কবিতাটি বাংলা দেশে অতিশয় পরিচিত। আবৃত্তিসভায় এটি প্রায়ই শোনা যায়। সে কবিতাটি এই সময়ে লিখিত হইয়াছিল।

জয়ন্তী উৎসব

ভগবান তুমি যুগে যুগে দূত পাঠায়েছ বারে বারে
দয়াহীন সংসারে,
তারা বলে গেল 'ক্ষমা করো সবে' বলে গেল 'ভালোবাসো-
অন্তর হতে বিদ্বেষবিষ নাশো'।
বরণীয় তারা, স্মরণীয় তারা, তবুও বাহির দ্বারে
আজি দুর্দিনে ফিরানু তাদের ব্যর্থ নমস্কারে।''
... ...
কণ্ঠ আমার রুদ্ধ আজিকে বাঁশি সংগীতহারা
অমাবস্যার কারা
লুপ্ত করেছে আমার ভুবন দুঃস্বপনের তলে
তাই তো তোমায় শুধাই অশ্রুজলে—
যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু নিভাইছে তব আলো,
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো।

পারস্য

এই সময় পারস্যে যাইবার নিমন্ত্রণ আসিল। কবি বলিতেছেন, "দেশ থেকে বেরোবার বয়স গেছে এইটেই স্থির করে বসেছিলুম। এমন সময় পারস্যরাজের কাছ থেকে নিমন্ত্রণ এল। মনে হল এ নিমন্ত্রণ অস্বীকার করা অকর্তব্য হবে। তবু ক্লান্ত শরীরের পক্ষে দ্বিধা ঘোচেনি।" কবির পারসী বন্ধু দিনশা ইরানী ভরসা দিয়া লিখিলেন পারস্যের বুশেয়ার বন্দর হইতে তিনিও কবির সঙ্গী হইবেন। পারসিক সরকারের পক্ষ হইতেও তাঁহার যাত্রার সকল রকম ব্যবস্থা করা হইয়াছে বলিয়া কবিকে জানানো হইল।

শেষ পর্যন্ত কবির দ্বিধা ঘুচিল। ১৯৩২-এর ১১ই এপ্রিল আকাশপথে পারস্য যাত্রা করিলেন।

১৩ই এপ্রিল বুশেয়ারে নামিয়া দুই দিন সেখানে থাকিলেন। বুশেয়ার হইতে মোটরে করিয়া গেলেন শিরাজে। শিরাজের সভায় কবিকে নাগরিক সংবর্ধনা দেওয়া হইল। শিরাজে কয়েকদিন থাকিয়া গেলেন ইস্পাহানে, ইস্পাহান হইতে তেহেরানে। তেহেরানে পারস্যরাজ রেজা শাহ পহ্লবীর সহিত কবির দেখা হয়। এই উপলক্ষে কবি নিজের কয়েকটি বই উপহার দেন। সেই সঙ্গে একটি বাংলা কবিতা এবং তাহার ইংরাজী অনুবাদও লিখিয়া দিয়াছিলেন। কবিতাটি এই ঃ

আমার হৃদয়ে অতীতস্মৃতির
সোনার প্রদীপ এ যে,
মরিচা ধরানো কালের পরশ
বাঁচায়ে রেখেছি মেজে।
তোমরা জ্বেলেছ নূতন কালের
উদার প্রাণের আলো,
এসেছি হে ভাই, আমার প্রদীপে
তোমার শিখাটি জ্বালো।

কবির ৭১ বৎসরের জন্মদিবসের (৬ই মে ১৯৩২) উৎসব এইখানে অনুষ্ঠিত হয়।

জন্মদিনে এখানকার বহু লোকের কাছ হইতে কবি যে বহু সমাদর পাইয়াছিলেন একত্রে তাহার উত্তর দিবার জন্য একটি কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। সেটি এখানে তুলিয়া দিলাম ঃ

ইরান, তোমার যত বুলবুল,
তোমার কাননে আছে যত ফুল.
বিদেশী কবির জন্মদিনেরে মানি
শুনালো তাহার অভিনন্দন বাণী।
ইরান, তোমার বীর সন্তান
প্রণয়-অর্ঘ্য করিয়াছে দান
আজি এ বিদেশী কবির জন্মদিনে,
আপনার বলি নিয়েছে তাহারে চিনে।

ইরান, তোমার সম্মানমালে
নব গৌরব বহি নিজ ভালে
সার্থক হল কবির জন্মদিন।
চিরকাল তারি স্বীকার করিয়া ঋণ
তোমার ললাটে পরানু এ মোর শ্লোক—
ইরানের জয় হোক।

ইরান পরিভ্রমণ শেষ হইল। কবি এবার ইরাকের দিকে মুখ ফিরাইলেন। ইরাক-সম্রাটের নিমন্ত্রণ পাইয়া কবি ১৫ই মে তেহেরান হইতে বিদায় লইয়া মোটরে বোগদাদ অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

বোগদাদেও আদর অভ্যর্থনার ত্রুটি হইল না। বোগদাদ মু্যনিসিপালিটি মু্যনিসিপাল উদ্যানে কবি-সংবর্ধনার আয়োজন করেন। এই সভায় কবিকে যে অভিনন্দন দেওয়া হয় তাহার উত্তরে তিনি ভারতবর্ষের সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ দূর করিবার ব্যাপারে তাঁহাদেব সহযোগিতা কামনা করেন।

প্রায় আট সপ্তাহ বাহিরে কাটাইয়া ৩রা জুন (১৯৩২) কবি কলিকাতায় ফিরিলেন।

কবির সন্তানদের মধ্যে পুত্র রথীন্দ্রনাথ এবং কন্যা মীরা দেবী এই দুইজন মাত্র জীবিত আছেন। মীরা দেবীর এক-মাত্র পুত্র নীতীন্দ্র তখন জার্মানিতে ছিলেন। হঠাৎ সেখানে তাঁহার গুরুতর অসুখ হয়। কবি দেশে ফিরিয়াই সে দুঃসংবাদ পাইলেন। সে অসুখ আর সারিল না, মাস খানেক

পরেই তাহার মৃত্যু হইল। কবি জীবনে মৃত্যুশোক অনেক পাইয়াছেন কিন্তু কখনো তাঁহার শোকের প্রকাশ বাহিরে কেহ দেখে নাই। একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলে রচনায় কখনো কখনো তাহার ছায়া মিলিতে পারে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক

এই সময় অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সেন অবসর গ্রহণ করায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপকের পদ খালি হইল। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলর। তাঁহার অনুরোধে কবি ঐ পদ গ্রহণ করিলেন। অধ্যাপক হইলেও তাঁহাকে নিয়মিত ক্লাসে পড়াইতে হইত না। বছরে কয়েকটি করিয়া বক্তৃতা দিতে হইত। এই অধ্যাপকের পদ তিনি লইয়াছিলেন মাত্র দুই বৎসরের জন্য।

'পরিশেষ' কাব্য বাহির হইয়া গিয়াছে। নূতন কবিতা লেখা চলিতেছে—গদ্য কবিতাই বেশী। 'পরিশেষ' নাম দেখিয়াই বোঝা যায় উহাকেই শেষ কাব্য বলিয়া ভাবিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার পরেও আর একটি কাব্যগ্রন্থ বাহির হইল তাহার নাম দিলেন 'পুনশ্চ'।

১৯৩২-এর জানুয়ারি মাস হইতে গান্ধীজি বিনাবিচারে আটক ছিলেন। তখনকার ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী ঘোষণা করিলেন হিন্দু জাতিটা এক নয়, তাহার অর্ধেক উঁচু বাকী অর্ধেক নীচু—বর্ণহিন্দু আর তপশিল হিন্দু। হিন্দুর মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করিয়া তাহাকে দুর্বল করিতে হইবে—এই ছিল তাঁহার মতলব। গান্ধীজি জেল হইতে এই বিপদের সংবাদ শুনিয়া প্রতিবাদ স্বরূপ অনশন আরম্ভ করিলেন। গান্ধীজির অনশনের খবর পাইয়া কবির উদ্বেগের সীমা রহিল না। দেশের

নেতারা কারাগারে। রবীন্দ্রনাথ কি করিবেন ভাবিয়া না পাইয়া গান্ধীজির সহিত দেখা করিবার জন্য পুনা রওনা হইলেন। সুখের বিষয় ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া গান্ধীজির মত মানিয়া লইলেন। গান্ধীজি সংবাদ পাইয়া অনশন ভঙ্গ করিলেন। অনশন ভঙ্গের সময় কবি গান্ধীজির কাছে বসিয়া একটি গান করেন। সেটি এই ঃ

জীবন যখন শুকায়ে যায়
করুণা ধারায় এসো।
সকল মাধুরী লুকায়ে যায়,
গীতসুধারসে এসো।
কর্ম যখন প্রবল আকার
গরজি উঠিয়া ঢাকে চারিধার
হৃদয়-প্রান্তে হে নীরব নাথ
শান্ত চরণে এসো।
আপনারে যবে করিয়া কৃপণ
কোণে পড়ে থাকে দীন হীন মন
দুয়ার খুলিয়া হে উদার নাথ,
রাজসমারোহে এসো।
বাসনা যখন বিপুল ধুলায়
অন্ধ করিয়া অবোধে ভুলায়
ওহে পবিত্র, ওহে অনিদ্র,
রুদ্র আলোকে এসো।

৬

২রা অক্টোবর গান্ধীজির জন্মদিন। পুনায় সে উপলক্ষে এক বিরাট সভা হইল। কবি সে সভায় এক ভাষণ দিলেন। তাহার পর শান্তিনিকেতনে আসিয়া আবার কাজে মন বসাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। 'দুইবোন' গল্পটি এই সময়ের রচনা।

১৯৩৩ সাল। বয়স বাহাত্তর পার হয় হয়। তবুও কাজের অন্ত নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি বক্তৃতাও এই সময় দেওয়া হইল। শরীর বড় ক্লান্ত। তাই গরমের ছুটিতে মাস-দুয়েকের জন্য দার্জিলিং-এ গিযা বিশ্রাম কবিয়া আসিলেন।

এবার শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া একটি নূতন নাটিকা লিখিলেন। নাম 'তাসের দেশ'। তাসের দেশের কাহিনী অংশ নূতন নয়। তখন হইতে চৌত্রিশ বৎসব আগে 'আষাঢ়ে গল্প' নামে যে একটি গল্প লিখিয়াছিলেন তাহাকে অবলম্বন করিয়াই এটি লেখা হইয়াছে। এই সময় 'চণ্ডালিকা' নামে একটি গীতি-নাট্যও লেখা হয়। চণ্ডালিকার বিষয়বস্তু লওযা হয় বৌদ্ধ অবদান সাহিত্যের একটি গল্প হইতে।

পূজার সময় কলিকাতায় নাটক-দুইটির অভিনয় হইল। নাটক-দুইটি দেখিয়া দর্শকেরা মুগ্ধ হইল। কবি শান্তি-নিকেতনে ফিরিয়া আসিলেন।

১৯৩৪-এব গোড়ায় বোম্বাইয়ে ডাক পড়িল—রবীন্দ্র-

সপ্তাহের অনুষ্ঠান। কবি ছাত্রছাত্রীদের লইয়া চলিলেন। সেখানেও অভিনয় হইল 'তাসের দেশ' আর 'শাপমোচন'। কবির চিত্রসমূহের একটি প্রদর্শনীও এখানে হয়।

বোম্বাই হইতে দলবল ফিরিয়া আসিল। কবি গেলেন ওয়ালটেয়ারে। অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিবার আমন্ত্রণ ছিল, বক্তৃতা দেওয়া হইল। সেখান হইতে গেলেন হায়দরাবাদে নিজামের রাজ্যে। এইভাবে প্রায় দেড়মাস ঘুরিয়া কবি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। কলিকাতায় তখন রামমোহন শতবার্ষিক উৎসবের অনুষ্ঠান চলিতেছিল। বিরাট স্মৃতি-সভায় কবি ভাষণ পাঠ করিলেন। সেখান হইতে ফিরিলেন শান্তিনিকেতনে।

শ্যামলী

১৯৩৪ সাল মে মাস। কবি তিয়াত্তর পার হইয়া চুয়াত্তরে পড়িলেন। এই বয়সেও এক জায়গায় চুপ করিয়া বেশীদিন বসিয়া থাকিতে পারেন না। দলবল লইয়া আবার বাহির হইয়া পড়িলেন। এবার চলিলেন সিংহলে। সিংহলের নানা স্থানে কবি সাদর সংবর্ধনা পাইলেন। শান্তি-নিকেতনের ছাত্রছাত্রীদের শাপমোচন অভিনয় দেখিয়া সিংহলের অধিবাসীরা মুগ্ধ হইয়া গেল। কবি জুন মাসে ফিরিয়া আসিলেন।

সিংহলে সেখানকার বিখ্যাত ক্যাণ্ডিনাচ দেখিয়া কবির খুব ভাল লাগে। একটি কবিতায় এই নাচের প্রসঙ্গ পাওয়া যায় ঃ

সিংহলে সেই দেখেছিলেম
        ক্যাণ্ডিদলের নাচ;
শিকড়গুলোর শিকল ছিঁড়ে
        যেন শালের গাছ
বেরিয়ে এল মুক্তিমাতাল খ্যাপা.
        হুংকার তার ছুটল আকাশব্যাপা।

সিংহল হইতে ফিরিবার সময় মাদ্রাজে নামিবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু এ যাত্রায় তাহা হইয়া উঠিল না। তাই পূজার ছুটিতে আবার মাদ্রাজ রওনা হইলেন। মাদ্রাজে শাপমোচন অভিনয়

হইল। দুই-একটি সভায় কবি বিশ্বভারতীর আদর্শের কথাও বলিলেন। মাদ্রাজে কবির আদর আপ্যায়ন একরকম হইয়াছিল বটে। কিন্তু কবির আগমনে অন্য সকল জায়গায় যেরূপ উৎসাহ উদ্দীপনা জাগিয়াছিল এখানে তেমন হয় নাই।

দেখিতে দেখিতে আরও এক বৎসর কাটিয়া গেল। ১৯৩৫-এর ফেব্রুয়ারি মাস। কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসব। অভিভাষণ দিবার জন্য মালব্যজির আহ্বান আসিয়াছে। স্থির হইয়াছে এই সমাবর্তন সভায় কাশী বিশ্ববিদ্যালয় কবিকে ডক্টর উপাধি দিয়া সম্মানিত করিবেন।

কবি কাশী যাত্রা করিলেন। কাশী হইতে এলাহাবাদ হইয়া গেলেন লখনৌ। সেখানে দিন পনের কাটাইয়া শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া আসিলেন।

এই সময়ে কবির খেয়াল হইল মাটির ঘরে থাকিবেন। যে মাটির ঘর গ্রামে গ্রামে দেখা যায়—মাটির দেওয়াল বাঁশের খুঁটি খড়ের চাল—সে মাটির ঘর নয়। ইহার সবটাই মাটির এমন কি চালটাও। কবির নিত্য-কৌতূহলী মনের ইহাও একটা পরিচয়। আলকাতরা গোবর এবং আরও কি কি মশলা মিশাইয়া মাটিকে এমনভাবে তৈয়ার করিতে হইবে যাহাতে সে জল নিরোধ করিতে পারে। এই পরীক্ষায় সহায়ক হইলেন শান্তিনিকেতনের দুই শ্রেষ্ঠ শিল্পী নন্দলাল বসু আর সুরেন্দ্রনাথ কর। সে পরীক্ষা সফল হইয়াছিল। তাহার সাক্ষ্য 'শ্যামলী' কুটির।

চুয়াত্তর পার হইয়া কবি যেদিন পঁচাত্তরে পড়িলেন সেদিন 'শ্যামলী'তে তাঁহার গৃহ-প্রবেশ হইল। শান্তিনিকেতনে গেলে যাত্রীরা সেই শ্যামলীকে আজও দেখিতে পাইবেন।

এই জন্মদিন উপলক্ষে পরশুরামের 'বিরিঞ্চি বাবা' অভিনীত হয়। শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কোনো লেখকের বই ইহার পূর্বে বোধহয় আর অভিনীত হয় নাই। অবশ্য শান্তিনিকেতনের ছাত্ররা নিজেরা নাটক রচনা করিয়া নিজেরা অভিনয় করিয়াছে এমন নজির শান্তিনিকেতনের ইতিহাস খুঁজিলে পাওয়া যাইবে।

এই জন্মদিবসেই কবির একটি নূতন কাব্যগ্রন্থ বাহির হইল নাম 'শেষ সপ্তক'। এই গ্রন্থে শ্যামলীর কথা আছে ঃ

আমার শেষবেলাকার ঘরখানি
বানিয়ে রেখে যাব মাটিতে,
তার নাম দেব শ্যামলী।

এই জন্মদিনকে স্মরণ করিয়াই কবি লিখিয়াছিলেন ঃ

পঁচিশে বৈশাখ চলেছে
জন্মদিনের ধারাকে বহন করে
মৃত্যু-দিনের দিকে।
সেই চলতি আসনের উপর বসে
কোন্ কারিগর গাঁথছে
ছোট ছোট জন্মমৃত্যুর সীমানায়
নানা রবীন্দ্রনাথের একখানা মালা।

এটিও 'শেষসপ্তকে'র কবিতা।

গরমে বিদ্যালয়ের ছুটি হইলে কবি কলিকাতায় আসিলেন। কলিকাতায় কয়েকদিন কাটাইয়া কবি কিছু দিনের জন্য বোটে চড়িয়া গঙ্গার বুকে আশ্রয় লইলেন। ঘাটে ঘাটে থামিতে থামিতে নৌকা আসিল চন্দননগরে।

এই চন্দননগরের গঙ্গার ঘাটেই জ্যোতিদাদার সঙ্গে একদিন যে দোতলা বাড়িতে ছিলেন সেই বাড়িটা ভাঙ্গাচোরা অবস্থায় এখনও ঘাটের পাশে দাঁড়াইয়া আছে। আজ সেই বাড়ির দিকে তাকাইয়া যৌবনের আনন্দময় দিনগুলির কথা মনে পড়িল। নৌকায় থাকিতে থাকিতেই কবি অনেকগুলি কবিতা লিখিলেন। এগুলি 'বীথিকা' কাব্যে প্রকাশিত হইয়াছে। বীথিকা হইতে নাট্যশেষ নামক কবিতার কয়েক ছত্র তুলিয়া দিতেছি, ইহাতে সেদিনকার আভাস পাওয়া যাইবে।

জনশূন্য ভাঙাঘাটে আজি বৃদ্ধ বটচ্ছায়াতলে
গোধূলির শেষ আলো আষাঢ়ে ধূসর নদীজলে
মগ্ন হল। ওপারের লোকালয় মরীচিকাসম
চক্ষে ভাসে। একা বসে দেখিতেছি মনে মনে, মম
দূর আপনার ছবি নাট্যের প্রথম অঙ্কভাগে
কালের লীলায়।

বিদ্যালয় খুলিলে কবি শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া আসিলেন। বিদ্যালয়ের কাজের সঙ্গে সঙ্গে কাব্যরচনা চলিতে লাগিল।

এমন সময় কলিকাতা হইতে সংবাদ পাইলেন দিনেন্দ্রনাথের মৃত্যু হইয়াছে।

দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর কবির দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথের পৌত্র। ইনি ছিলেন কবির "সকল গানের ভাণ্ডারী"। তাঁহার পরম স্নেহের পাত্র। এক বৎসর আগে পর্যন্ত তিনি ছিলেন আশ্রমেরই অধিবাসী। তাই তাঁহার মৃত্যুতে আশ্রমে একটি শোকের ছায়া পড়িল।

বাহিরের আঘাত কবির মনে যতই দাগ কাটিয়া যাক না কেন বাহিরে তাহা প্রকাশ পায় না। তাঁহার সৃষ্টির কাজ সমান বেগে চলিতে থাকে। কিন্তু শরীর ক্রমশঃ অপটু হইয়া আসিতেছে। এখন কর্মে ক্লান্তি আসে। সে ক্লান্তি যতটা দেহের ততটা মনের নয়।

পূজার ছুটি আসিয়া পড়িল। এবার তিনি আর কোথাও বাহির হইলেন না। একলাই শান্তিনিকেতনে রহিয়া গেলেন।

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শতবার্ষিক উৎসব আসন্ন। সারা-দেশ জুড়িয়া তাহার আয়োজন চলিতেছে। শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত-গণের অনুরোধে কবি একটি বাণী পাঠাইলেন ঃ

বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা
ধেয়ানে তোমার মিলিত হয়েছে তারা।
তোমার জীবনে অসীমের লীলাপথে
নূতন তীর্থ দেখা দিল এ-জগতে।
দেশ-বিদেশের প্রণাম আনিল টানি,
সেথায় আমার প্রণতি দিলাম আনি।

দার্শনিক ব্রজেন্দ্রনাথ শীল কবির পুরাতন বন্ধু। এই সময় কলিকাতায় তাঁহার সংবর্ধনার আয়োজন হয়। সেই সভায় উপস্থিত থাকিবার জন্য রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হইল। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ তিনি যাইতে

পারিলেন না, ব্রজেন্দ্রনাথের উদ্দেশে অভিনন্দন জানাইয়া একটি কবিতা লিখিয়া পাঠাইয়া দিলেন।

১৯৩৬-এর গোড়ার দিকে কলিকাতায় এক সপ্তাহব্যাপী এক শিক্ষা সম্মেলনের অনুষ্ঠান হইল। এই উপলক্ষে কবি কলিকাতায় গিয়া শিক্ষা বিষয়ে দুইটি প্রবন্ধ পড়িলেন।

এই বৎসর কাব্যনাট্য চিত্রাঙ্গদাকে কবি নৃত্যনাট্যের রূপ দিলেন। শান্তিনিকেতনে তাহার অভিনয়ও হইল।

বিশ্বভারতীর খরচ চালানো কঠিন। এক একবার ছাত্র-ছাত্রীদের লইয়া বাহিব হন, নৃত্য-গীত-অভিনয় করিয়া কিছু অর্থ সংস্থান হয়। এমনি করিয়া কষ্টে সৃষ্টে বিদ্যালয়ের ব্যয় কিছুটা নির্বাহ হয়—বাকীটা চলে ঋণে। এইভাবে দেনার দায় ভারী হইয়া উঠিয়াছে। তাই এই বৃদ্ধবয়সেও কবিকে আবার বাহির হইতে হইল। চিত্রাঙ্গদার দল লইয়া কবি পাটনা, এলাহাবাদ, লাহোর ঘুরিয়া দিল্লীতে আসিয়া পৌঁছিলেন।

গান্ধীজি তখন দিল্লীতে ছিলেন। বিদ্যালয়ের জন্য কবিকে যে এত কষ্ট সহ্য করিতে হইতেছে তাহা দেখিয়া তিনি নিজের চেষ্টায় কবিকে ষাট হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়া দেন।

বিশ্বভারতীর ষাট হাজার টাকার ঘাটতি—ইহার দ্বারা পূরণ করা সম্ভব হয়। কবি শান্তির নিশ্বাস ফেলিয়া দেশে ফিরিয়া আসেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত কবির যে যোগ ঘটিয়া-

ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে সেটা একটা ঐতিহাসিক ঘটনা। ১৯৩৭-এর গোড়ায় নূতনতর ইতিহাসের সৃষ্টি হইল। ১৮৫৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ম। সেইদিন হইতে সমা-বর্তন সভায় ইংরাজী ছাড়া আর কোনো ভাষায় কেহ কখনো ভাষণ দেন নাই। রবীন্দ্রনাথই প্রথম দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে দেশের ভাষায় অভিভাষণ পাঠ করিলেন। এ ঘটনা শুধু বাংলা দেশের পক্ষে অভিনব নয়, সারা ভারতবর্ষের পক্ষে।

বিজ্ঞান বিষয়ে কবির অনুরাগের কথা আমরা জানি। বাল্যকাল হইতেই বিজ্ঞানের প্রতি তাঁহার গভীর আকর্ষণ। বিজ্ঞান শাস্ত্রের অনেক বড় বড় বই তিনি পড়িয়াছেন, পড়িয়া আনন্দ পাইয়াছেন। এই বৃদ্ধবয়সে বিজ্ঞান বিষয়ে একটি বই লিখিয়া ফেলিলেন। বইটির নাম 'বিশ্বপরিচয়'। বাংলা-সাহিত্যে এ বইটি একটি অমূল্য সম্পদ।

একদিকে বিজ্ঞানের বই, আর একদিকে শিশুদের জন্য হালকা ঢঙের ছড়া—দুই একসঙ্গে চলিতেছে। ছবি আঁকারও বিরাম নাই। বৃদ্ধবয়সী এই শিশুটির দেখা পাই 'ছড়ার ছবি' বইটিতে। কোনো কোনো কবিতায় দেখি কবি বাল্যবয়সের স্মৃতির মধ্যে ডুব দিয়াছেন ঃ

বয়স তখন ছিল কাঁচা; হালকা দেহখানা
ছিল পাখির মতো শুধু ছিল না তার ডানা।
উড়ত পাশের ছাদের থেকে পায়রাগুলোর ঝাঁক,
বারান্দাটার রেলিং 'পরে ডাকত এসে কাক।

ফেরিওআলা হেঁকে যেত গলির ওপার থেকে
তপসিমাছের ঝুড়ি নিত গামছা দিয়ে ঢেকে।
...   .
জানার সঙ্গে আধেক জানা দূরের থেকে শোনা
নানা রঙের নানা সুতোয় সব দিয়ে জাল বোনা,
নানা রকম ধ্বনির সঙ্গে নানান চলা ফেরা
সব দিয়ে এক হালকা জগৎ মন দিয়ে মোর ঘেরা,
ভাবনাগুলো তারই মধ্যে ফিরত থাকি থাকি,
বানের জলে শেওলা যেমন, মেঘের কোলে পাখি।

দেহটা অচল হইয়া আসিতেছে কবি বুঝিতে পারিতেছেন, তবু কাজকর্ম যথারীতি চালাইয়া যাইতেছেন।

বর্ষায় দলবল লইয়া কলিকাতায় গেলেন, সেখানে বর্ষা-মঙ্গল অনুষ্ঠান হইল। কলিকাতা হইতে যখন ফিরিলেন তখন শরীর বড় ক্লান্ত। সেটা বিশেষ ভাবে টের পাওয়া গেল একদিন সন্ধ্যাবেলা, সেদিন কবি হঠাৎ অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। সংবাদ পাইয়া কলিকাতা হইতে ডাক্তার নীলরতন সরকার আসিলেন। তাঁহার চিকিৎসায় সে যাত্রা বিপদ কাটিয়া গেল। চৈতন্য ফিরিয়া পাইয়া তাঁহার মনে হইল যেন মৃত্যুলোক হইতে ফিরিয়া আসিলেন। এই সময়কার মনের ছবিটি দেখিতে পাওয়া যায় 'প্রান্তিক' কাব্যে।

১৯৩৮ এর মে মাস। সাতাত্তর বৎসর পূর্ণ করিয়া কবি আটাত্তরে পা দিলেন। গরমের সময় আসিয়াছেন কালিম্পঙে। জন্মদিন এখানেই কাটিল। কবি সে উপলক্ষে ঐখানে বসিয়াই একটি কবিতা পড়িলেন, আকাশবাণীর ব্যবস্থায় তাহা বেতারে প্রচারিত হইল। কবিতাটির প্রথম কয়েকছত্র উদ্ধৃত করিঃ

আজ মম জন্মদিন। সদ্যই প্রাণের প্রান্তপথে
ডুব দিয়ে উঠেছি সে বিলুপ্তির অন্ধকার হতে

মরণের ছাড়পত্র নিয়ে। মনে হতেছে কী জানি
পুরাতন বৎসরের গ্রন্থিবাঁধা জীর্ণ মালাখানি
সেথা গেছে ছিন্ন হয়ে; নবসূত্রে পড়ে আজি গাঁথা
নব জন্ম দিন।

কালিম্পং হইতে গেলেন মংপুতে। সেখানে কিছুদিন কাটাইয়া আবার গেলেন কালিম্পঙে।

এই সময়টায় লেখার বিরাম নাই। 'বাংলা ভাষা পরিচয়'টা এই সময়েই লেখা হয়। ইহা ছাড়া কবিতা তো আছেই। এই সময়কার অনেক কবিতা আছে 'সানাই' 'সেঁজুতি' ও 'নবজাতক' গ্রন্থে।

সেঁজুতি গ্রন্থটি সার নীলরতন সরকারকে এই বলিয়া উৎসর্গ করেনঃ

আলো আঁধারের ফাঁকে দেখা যায়
অজানা তীরের বাসা
ঝিমি ঝিমি করে শিরায় শিরায়
দূর নীলিমার ভাষা।
সে ভাষার আমি চরম অর্থ
জানি কিবা নাহি জানি—
ছন্দের ডালি সাজানু তা দিয়ে
তোমারে দিলাম আনি।

মংপু হইতে কবি শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া আসিলেন। বর্ষা কাটিল। পূজার ছুটিতেও আর বাহিরে গেলেন না। আপন মনে কবিতা লিখিয়া যাইতেছেন। প্রবন্ধও লিখিতেছেন। এমনি করিয়া পৌষের উৎসবও শেষ হইয়া গেল।

১৯৩৯ সালের জানুয়ারি মাসে জহরলাল আসিলেন হিন্দী ভবনের উদ্‌বোধন উপলক্ষে। সুভাষচন্দ্রও এই সময়ে শান্তি-নিকেতনে আসেন। সুভাষচন্দ্র তখন কংগ্রেস সভাপতি। শান্তিনিকেতনে কবির সান্নিধ্যে এই দুইজন পৃথিবীবিখ্যাত জননায়ক মিলিত হন। আর একজন রাষ্ট্রনেতাও এই সময় আশ্রমে আসিয়াছিলেন—ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ। সেদিনকার বিহারের জননায়ক রাজেন্দ্রপ্রসাদ আজ ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতি। কিন্তু কবিগুরুর প্রতি তাঁহার ভক্তি সেদিন যেমন ছিল আজও তেমনি আছে।

লোকজন অতিথি অভ্যাগতের ভিড়েব মধ্যেও নাটকের রিহার্সাল চলিতেছে।—তিনটি নাটকের রিহার্সাল—তাসের দেশ, শ্যামা ও চণ্ডালিকা। ফেব্রুয়ারি মাসে কলিকাতায় তিনটি নাটকেরই অভিনয় হইল।

১৯৩৯ সালের গরমের প্রথম দিকটা কাটিল পুরীতে। এবারকার জন্মদিনও এইখানেই অনুষ্ঠিত হইল। পুরী হইতে

চলিয়া গেলেন মংপুতে। জুন মাসের মাঝামাঝি সেখান হইতে শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া আসিলেন।

আগষ্ট মাসে ডাক আসিল সুভাষচন্দ্রের কাছ হইতে, মহাজাতি সদনের ভিত্তি স্থাপন করিতে হইবে। কবি কলিকাতায় গিয়া মহাজাতি সদনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করিয়া আসিলেন। মহাজাতি সদন নামটিও কবির দেওয়া।

মংপু জায়গাটা কবির ভাল লাগিয়াছে। সেখানে শরীর বিশ্রাম পায়, মনটাও প্রসন্ন থাকে। তাই ১৯৩৯-এর পূজার ছুটিটা ওখানেই কাটাইলেন।

দেশের রাজনৈতিক অবস্থা খুবই ঘোরালো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হইয়াছে। ভারতবর্ষের সঙ্গে সে যুদ্ধের কোনো সম্পর্ক নাই তবু ইংরেজের অধীন বলিয়া আমরাও জড়িত হইয়া পড়িয়াছি। কবির হাতে কবিতার সঙ্গে রাজনীতির প্রবন্ধও বাহির হইতেছে।

মংপু হইতে ফিরিয়া গেলেন মেদিনীপুর, বিদ্যাসাগর স্মৃতিমন্দিরের উদ্‌বোধন করিতে। বিদ্যাসাগরের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আন্তরিক শ্রদ্ধার পরিচয় নানা প্রসঙ্গে প্রকাশ পাইয়াছে। এবার বলিলেন,

> "বঙ্গসাহিত্যে আমার কৃতিত্ব দেশের লোকে যদি স্বীকার করে থাকেন, তবে আমি যেন স্বীকার করি একদা তার দ্বার উদ্‌ঘাটন করেছেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।"

শরীর বিশ্রাম চায় কিন্তু বিশ্রাম পাইতেছে না। ১৯৪০-এর গোড়ার দিকে গান্ধীজি ও কস্তুরাবাঈ আশ্রমে আসিয়া দুই দিন থাকিয়া গেলেন। কবি বুঝিতে পারিয়াছেন তাঁহার বিদায়ের দিন আসন্ন। অথচ বিশ্বভারতীর জন্য তাঁহার ভাবনার অন্ত নাই। তাই তিনি গান্ধীজির হাতে বিশ্বভারতীর ভবিষ্যতের সকল ভার তুলিয়া দিলেন। তাহা যে ব্যর্থ হয় নাই আজিকার বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে তাকাইলেই সে কথা অনায়াসে বুঝা যাইবে।

অক্সফোর্ডের উপাধি

দেহের অস্বাস্থ্য মনের অশান্তি—কিন্তু লেখার স্রোত অব্যাহত। হাসির কবিতা লিখিতেছেন। 'প্রহাসিনী' ও 'খাপছাড়া'য় তাহাদের দেখা পাওয়া যাইবে। এই সময় বাল্য-কালের কথা পূর্বস্মৃতির আকারে মনের আকাশে হাল্‌কা মেঘের মত এক একবার ভাসিয়া উঠে। তাহারই পরিচয় আছে 'ছেলেবেলা'য়।

১৯৪০-এর আগস্ট। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় কবিকে ডক্টর উপাধি দেন। সে উপলক্ষে—শান্তিনিকেতনে খুব সমারোহ হয়। ফেডারাল কোর্টের প্রধান বিচারপতি সার মরিস গয়ার অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে আসিয়া মানপত্র পাঠ করিলেন। সে মানপত্রের ভাষা ল্যাটিন। কবি তাঁহার প্রতি-ভাষণ পাঠ করিলেন সংস্কৃতে।

এবার শরীর খুব ভাঙিয়া পড়িয়াছে। চিকিৎসকেরা বলিলেন সম্পূর্ণ বিশ্রাম আবশ্যক। কিন্তু কবি কাহারও কথা না শুনিয়া কালিম্পং যাত্রা করিলেন। সেখানে দিন সাতেক কাটিল, তাহার পর একদিন হঠাৎ অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। ২৯শে সেপ্টেম্বর অচেতন অবস্থায় তাঁহাকে কলিকাতায় আনা হইল। প্রায় মাস দেড়েক শয্যাগত থাকিয়া সে যাত্রা সারিয়া উঠিলেন।

প্রতিমা দেবী লিখিয়াছেন,

> "..দ্বিতীয় মাস থেকে তিনি সম্পূর্ণ চেতনা ফিরে পান এবং মুখে মুখে ছড়া তৈরি করেন, কবিতা লিখতে থাকেন; সেই সময় আশেপাশে যাঁরা থাকতেন তাঁরা টুকে নিতেন সেই সব রচনা।..... কলকাতায় থাকার সময় শেষের দিকে যে কবিতাগুলি লিখেছিলেন, বেশির ভাগ সেইগুলি 'রোগশয্যায়' নাম দিয়ে ছাপা হয়।"

জ্ঞান ফিরিবার পর যে কবিতাটি প্রথম রচনা করেন সেই কবিতার শেষের চারিটি ছত্র তুলিয়া দিতেছি। রচনার তারিখ ৩০ অক্টোবর ১৯৪০।

প্রহর পরে প্রহর যে যায়,
বসে বসে কেবল গনি
নীরব জপের মালার ধ্বনি
অন্ধকারের শিরে শিরে।

নভেম্বরের মাঝামাঝি কবি শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া আসিলেন। এখানেও মুখে মুখে কবিতা রচনা চলিতে থাকিল। পাশের সেবকরা লিখিয়া লইতেছেন। এই সময়কার তেত্রিশটি কবিতা 'আরোগ্য' গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। কবি হাসিমুখে পৃথিবীর কাছে বিদায় লইতেছেন। আজ তাঁহার কোনো দুঃখ নাই। আজ

"সব ক্ষতি মিথ্যা করি অনন্তের আনন্দ বিরাজে।"

রবীন্দ্রজীবনের শেষ বৎসরের আর একটি সৃষ্টি 'গল্প সল্প'। ইহার কিছুটা গদ্য আর কিছুটা ছড়া-জাতের কবিতা, শিশুদের জন্য লেখা। প্রকাশিত হয় ১৩৪৮-এর বৈশাখ মাসে।

সম্মুখে শান্তি পারাবার

দেখিতে দেখিতে আবার কবির জন্মদিন আসিয়া পড়িল—১৩৪৮-এর ২৫শে বৈশাখ—৮ই মে, ১৯৪১। কবির মর্ত্য-জীবনের শেষ ২৫শে বৈশাখ। সেদিন লিখিলেন ঃ

আমার এ জন্মদিন-মাঝে আমি হারা
আমি চাহি বন্ধুজন যারা
তাহাদের হাতের পরশে
মর্ত্যের অন্তিম প্রীতিরসে
নিয়ে যাব জীবনের চরম প্রসাদ
নিয়ে যাব মানুষের শেষ আশীর্বাদ।
শূন্য ঝুলি আজিকে আমার;
দিয়েছি উজাড় করি
যাহা কিছু আছিল দিবার,
প্রতিদানে যদি কিছু পাই—
কিছু স্নেহ কিছু ক্ষমা—
তবে তাহা সঙ্গে নিয়ে যাই
পারের খেয়ায় যাব যবে
ভাষাহীন শেষের উৎসবে।

এই সময় ব্রিটিশ পার্লামেন্টের মহিলা সদস্য মিস রাথবোন ভারতবর্ষের প্রতি কটূক্তি করিয়া এক খোলা চিঠি লিখেন। রবীন্দ্রনাথ রোগশয্যা হইতেই তীব্র ভাষায় তাহার প্রতিবাদ

করিলেন। সংসারে যতদিন আছেন ততদিন সংসারের দাবি ষোল আনাই মিটাইতে হইবে—এই তাঁহার জীবনের মন্ত্র।

বৈশাখ গেল, জ্যৈষ্ঠ গেল, শান্তিনিকেতনের আকাশে আষাঢ়ের মেঘ দল বাঁধিয়া জমা হইল। দু-এক পশলা বৃষ্টিও হইয়া গেল। কবি খোলা আকাশে বর্ষার রূপ দেখার জন্য উতলা হইয়া উঠিলেন। তখন তাঁহাকে উত্তরায়ণের দোতলায় আনিয়া বসানো হইল।

অসুখের উপশম হইতেছে না। কবিরাজী চিকিৎসার ব্যবস্থা হইল তাহাতেও ফল হইল না। শেষ পর্যন্ত কলিকাতায় লইয়া যাওয়াই ঠিক হইল। ডাক্তাররা বলিলেন অস্ত্র করিতেই হইবে। অপারেশন ছাড়া আর কোনো পথ নাই।

২৫শে জুলাই কবি শান্তিনিকেতন হইতে শেষ বিদায় লইলেন। পৃথিবীর আলো চোখ মেলিয়া প্রথম দেখিয়াছিলেন যে গৃহে, নয়ন মুদিবার পূর্বে সেই গৃহেই ফিরিয়া আসিলেন।

অপারেশন হইল ৩০শে জুলাই। অপারেশনের একটু আগেই এই কবিতাটি মুখে মুখে বলিয়া যানঃ

তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি
বিচিত্র ছলনাজালে
হে ছলনাময়ী।
মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ পেতেছ নিপুণ হাতে
সরল জীবনে।
এই প্রবঞ্চনা দিয়ে মহত্ত্বেরে করেছ চিহ্নিত;

তার তরে রাখনি গোপন রাত্রি।
তোমার জ্যোতিষ্ক তারে
যে-পথ দেখায়
সে যে তার অন্তরের পথ,
সে যে চির স্বচ্ছ
সহজ বিশ্বাসে সে যে
করে তারে চির সমুজ্জ্বল।
বাহিরে কুটিল হোক অন্তরে সে ঋজু,
এই নিয়ে তাহার গৌরব।
লোকে তারে বলে বিড়ম্বিত
সত্যেরে সে পায়
আপন আলোকে ধৌত অন্তরে অন্তরে'
কিছুতে পারে না তারে প্রবঞ্চিতে,
শেষ পুরস্কার নিয়ে যায় সে যে
আপন ভাণ্ডারে।
অনায়াসে যে পেরেছে ছলনা সহিতে
সে পায় তোমার হাতে
শান্তির অক্ষয় অধিকার।

শেষ চিকিৎসাও নিষ্ফল হইল। ২২শে শ্রাবণ মধ্যাহ্নে কবি পৃথিবী হইতে বিদায় লইলেন। বাংলা দেশ রুদ্ধকণ্ঠে গাহিল ঃ

সম্মুখে শান্তি পারাবার,
ভাসাও তরণী, হে কর্ণধার।
তুমি হবে চিরসাথি,
লও লও হে ক্রোড় পাতি—
অসীমের পথে জ্বলিবে জ্যোতি ধ্রুব তারকার।
মুক্তিদাতা, তোমার ক্ষমা, তোমার দয়া;
হবে চিরপাথেয় চিরযাত্রার।
হয় যেন মর্ত্যের বন্ধন ক্ষয়
বিরাট বিশ্ব বাহু মেলি লয়—
পায় অন্তরে নির্ভয় পরিচয় মহা-অজানার ॥